শুকতারা
ড়বিংশ বর্ষ • ষষ্ঠ সংখ্যা
শ্রাবন • ১৩৮০

রহস্যময় অভিযাত্রী

অভিযাত্রী সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেলো বুলেটে!

দুম!!

সামনের ঐ নারকেল গাছে যেন আগুনের ঝিলিক দেখলাম!

আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে ও আর কাউকে সতর্ক করবার সময় পেয়েছে কি?

কিন্তু তাকে আর দ্বিতীয়বারের সুযোগ দিলো না অভিযাত্রী!

অব্যর্থ নিশানা

এবার আমার পালা!

দুম! দুম!

শকুনি মামার সংগে শলা পরামর্শ করে দুর্যোধন পাশা খেলতে ডাকলেন যুধিষ্ঠিরকে। পাশা খেলতে খুবই ভালবাসেন যুধিষ্ঠির। দুর্যোধনের হয়ে খেলতে বসলেন চতুর শকুনি। খেলায় সব হারালেন যুধিষ্ঠির। মায়—দ্রৌপদীকে।...

দুঃশাসন তাঁকে চরম অপমান করলেন। এমন কি সকলের সামনে বস্ত্রহরণের চেষ্টাও চলল।...ভীম প্রতিজ্ঞা করলেন—প্রতিশোধ নেব।

ধৃতরাষ্ট্র অবশ্য সবই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন প্রথম বার। কিন্তু আবার ফাঁদে পা দিলেন যুধিষ্ঠির। খেলতে গিয়ে এবার ফল— বারো বছরের জন্য বনবাস, আর এক বছর অজ্ঞাতবাস। পাণ্ডবেরা চললেন বনে।

অমৃত সমান মহাভারত-কথা

বোরোলীন

হাউস কর্তৃক প্রচারিত

বোরোলীন

সুরভিত

অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

কাটা-ছেঁড়া-কাটা, রুক্ষ-শুষ্ক

কিংবা ঝলসানো ত্বকের

অনবদ্য নিরাময়—।

(চলবে)

বাঁটুল দি গ্রেট

খবর পেলুম শয়তান দুটো আজও স্কুল পালিয়েছে। নে ভেদো ওদের রুমাল শুঁকে নিয়ে ওদের খুঁজে বের কর!
উঁহু উঁহু
দেখেছিস, বাঁটলোর কুকুর ঠিক আমাদের হদ্দিশ বের করেছে!
শীগগির গুঁড়ির ওপর দিয়ে খালের ওপারে চল!
ঘেউ ঘেউ
দ্যাখনা, ব্যাটাকে কেমন জলে চোবাই!
আমাদের ধরতে পারবি ঘন্টা!
ঝপাস!
হাঃ হাঃ হাঃ!
হাঃ হাঃ! ভররবে! ভেদোটাকে জলে চোবানি খাইয়েছি!
গরর!
ওস্! একটা রামছাগল! ব্যাটা গোত্তা মেরে আমাদেরও জলে ফেলে দিলো!
ঝপাৎ!
বাঁচাও! বাঁচাও! কুকুরে খেয়ে ফেললে রে!
হতচ্ছাড়াটা প্রায় ঘাড়ে এসে পড়েছে! যে কোনো মুহূর্তে ওর দাঁত আমার প্যান্টের ওপর বসিয়ে দেবে!
ইয়াহু! ছাগলই আমাদের বাঁচিয়েছে!

দ্যাখ! ছাগলটা আবার ভেদোটাকে গোঁত্তা মারতে যাচ্ছে!
ঘরর ঘরর
ওফ্‌ফ! শূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছে!
বিটকেল হতচ্ছাড়া ভুদোও এইবার কাউকে ভয় খেলো!
জীয়ো ব্যাটা রামছাগল, জীয়ো!
বাঁটুল! আমার ছাগল 'গুণ্ডার' বিক্রমের ঠ্যালায় তোমার কুকুর গাছে উঠে বসে আছে!
আমাকে এখনি গিয়ে ভেদোকে উদ্ধার করতে হবে! পেছনে কয়েকটা বসার গদি বেঁধে যাই!
বেচারা ভেদো! কোনো ভয় নেই, আয় নেমে আয়!
কুকুরের মালিক বোধহয় ভয়ে পাছায় গদি বেঁধে এসেছে!
এই তো নেমেছিস! এবারে বাড়ি চল।
একি রে বাবা! এতো প্রচণ্ড ঢুঁয়েতেও ওর কিছুই হলোনা, উল্টে ছাগলটাই কুঁকড়ে গেলো!
ওজে শুধু কুঁকড়ে গেছে! বাঁটলোর পেছনে গদি বাঁধা না থাকলে আপনাকে এতোক্ষণে ছাগলের শোকে ডুকরে কাঁদতে হতো!

"শুকতারা"

Approved by the Directorate of Public Instruction, West Bengal as Children's Monthly Magazine vide No. 321 (9)-T. B. C.

(Dated 14th August, 1971, 2B-20G/71)

সূচীপত্র—শ্রাবণ, ১৩৮০

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	রহস্যময় অভিযাত্রী ...	নারায়ণ দেবনাথ ...	প্রচ্ছদপট
২।	বাঁটুল দি গ্রেট ...	নারায়ণ দেবনাথ ...	প্রথম ছবি
৩।	আজব সালসা (কবিতা) ...	অরুণ চট্টোপাধ্যায় ...	৩৮৭
৪।	রূপকথার ফুলঝুরি (গল্প) ...	ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য ...	৩৮৮
৫।	অদৃশ্য হওয়া (মজার ছবি) ...	— ...	৩৯৬
৬।	এক জাহাজ ভূত (বিদেশী গল্প) ...	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	৩৯৭
৭।	সোনা ও রূপা (ছবিতে গল্প) ...	দিলীপ দাস ...	৪০৬
৮।	ধর্মরাজ ইল্বল চোল (অমর বীর কাহিনী) ...	শ্রীমধুসূদন মজুমদার ...	৪০৮
৯।	মজার ছবি ...	— ...	৪১৬
১০।	ঘোঁতনদার বিয়েতে (গল্প) ...	জীবন ভৌমিক ...	৪১৭
১১।	সোনার ঘণ্টা (ধারাবাহিক উপন্যাস) ...	অনিল ভৌমিক ...	৪২১
১২।	পৃথিবী যখন ধ্বংস হল (বিজ্ঞান) ...	শ্রীবৈজ্ঞানিক ...	৪২৭
১৩।	মজার প্রশ্ন ...	— ...	৪৩৮
১৪।	জাবাল্‌জা ও টারজান (অ্যাডভেঞ্চার) ...	সব্যসাচী ...	৪৩৯
১৫।	পৃথিবীর নবম আশ্চর্য ...	রিপ্লে থেকে ...	৪৪৭
১৬।	হাঁদা-ভোঁদার চাকরি করা (ছবিতে গল্প) ...	— ...	৪৪৮
১৭।	শ্যামলী গাই (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা) ...	ইভারানী মুখোপাধ্যায় ...	৪৫০
১৮।	৪৩৮ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর ...	— ...	৪৫৩
১৯।	নিজের ফাঁদে (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা) ...	শ্রীঅশোকবরণ চক্রবর্তী ...	৪৫৪
২০।	নতুন গাড়ি (জানবার কথা) ...	— ...	৪৫৭
২১।	অপরাজিতা মেয়ে (জীবন কথা) ...	শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৫৮
২২।	"৺পরিমল স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা)	— ...	৪৫৯
২৩।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ...	— ...	৪৬০

এস. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ৮০ পয়সা

“বাবা, এবার জন্মদিনে আমি কি চাই জানো?... এক বাক্স ক্যামেল রং”

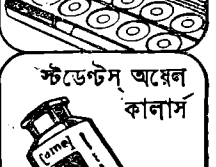

বাবা জানো, সেদিন দেখলাম রাজু তার ক্যামেল রং দিয়ে কত সুন্দর ছবি পেণ্ট করেছে,—সে রং যেমন সুন্দর তেমন উজ্জ্বল। তাছাড়া, রাজু বল্ল যে এ রং অনেক দিন চলে। তাই, এবার জন্মদিনে আমারও ক্যামেল রংয়ের বাক্স চাই। বাবা, তুমি আমায় এনে দেবে **তো?**

ক্যামেল
আর্ট কালার্স

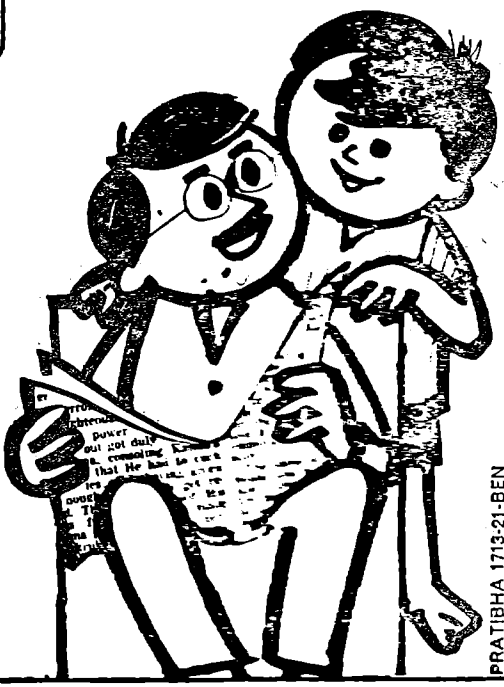

ক্যামলিন প্রাইভেট লিমিটেড,
আর্ট মেটেরিয়াল ডিভিশন,
জে. বি. নগর,
বোম্বাই-৪০০ ০৬৯ (ভারত)

PRATIBHA 1713-21-BEN

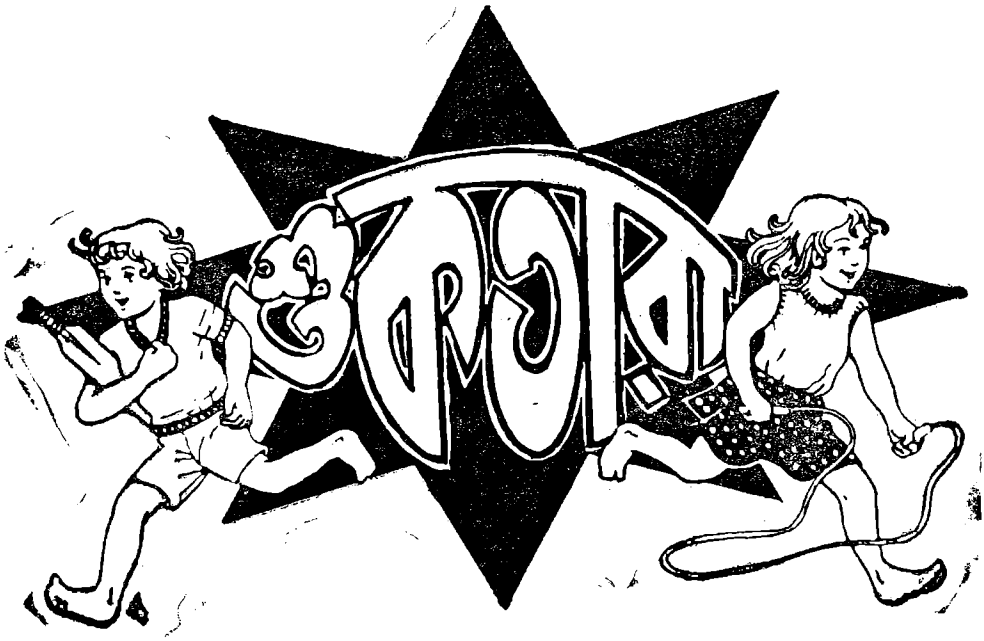

ষষ্ঠবিংশ বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা : ১৩৮০, শ্রাবণ

আজব সালসা

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

নটবর শোন শোন
কেন করো দোনোমোনো
সালসা যে মালসায় রয়
খেয়ে দেখো চেখে দেখো
কিংবা মাথায় মাখো
কেটে যাবে যত রোগ ভয়।
যদি ভূতে মারে কিল
পায়ে কভু ধরে খিল
অথবা দাঁতেতে পোকা হয়
নাকে শুঁকে, গায়ে মেখে
একবার চেটে দেখে
পাবে ঠিক এর পরিচয়।

আরে আরে কোথা যাও
কেন বাপু সটকাও
খসাও তো ছুটো টাকা সার
এক শিশি ফাউ দেবো
চার টাকা ধার নেবো
ছ টাকার হল কারবার।
ওহে বাপু রাগ কেন
ভাল রোগ নয় যেন
তোমারই তো দরকার আগে।

প্রথমেতে জিভে ঢালো
চোখে দেখে এলোমেলো
তারপরে ব্যাস কাজ শুরু।
ওরে বাবা কি বলো
কাজ তবে পাকা হলো
বুক খালি করে গুরু গুরু।
হরি হরি মুখে ডাকো
ব্যাস! নিশ্চিন্তে থাকো
তারপরে নাড়ী থমথমে
চোস্ত হল বন্দোবস্ত
ছিরকুটে ন্যস্ত হস্ত
নিয়ে যাবে মহারাজ যমে।
সালসা মোর নামকরা
ছুটেছো ভয়েতে সারা
ছাড়ছি না তোমাকে সহজে
গবেষণা উদযোগী
ভেগেছে হাজার রোগী
ঢোকেনি কাহার মগজে।

রূপকথার ফুলঝুরি

ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র। রাজার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনে বসলেন। ছোট ছেলেটি একেবারে রিক্ত, নিঃসহায়। বড় ভাই ও ভ্রাতৃজায়ার দুর্ব্যবহারে সে একদিন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় বাইরের ঘরে দেয়ালে টাঙানো পিতার বৃহৎ তৈলচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে বলল—বাবা বড় দুঃখে ভিটে ছেড়ে চললুম। আমি তো কিছুই পেলুম না। ওপর থেকে আমায় আশীর্বাদ পাঠাও—সেইটাই আমার যাত্রাপথের পাথেয় হোক।

উদ্দেশ্যহীনভাবে নানা জায়গায় রাজপুত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এক দেশে এসে শুনলো, সে দেশের রাজকন্যা কথা বলেন না। যে তাঁকে কথা বলাতে পারবে, রাজা তাঁর একমাত্র কন্যার সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন। রাজপুত্র সাহস করে এগিয়ে গেলেন রাজপ্রাসাদের দিকে। দরজায় একটা জয়ঢাক ঝোলানো আছে। রাজপুত্র তাতে ঘা মারতেই অন্দর থেকে প্রহরী বেরিয়ে এল। রাজপুত্র নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করল। কিছুক্ষণ পরে তাকে দেউড়ীতে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ দেশের রাজপুত্র তুমি? কারণ রাজপুত্র ছাড়া অন্য কারও প্রবেশ নিষেধ সেখানে। রাজপুত্র নিজের পরিচয় দিলেন। রাজা বললেন, আমার সঙ্গে এস। রাজপুত্র রাজার পিছে পিছে চললো। এ মহল সে মহল করে নিয়ে যাচ্ছেন, মহল আর শেষ হয় না। অবশেষে এক বিরাট

হল ঘরের সম্মুখে এসে রাজা বললেন, যুবক, তুমি কথা বলতে পারবে? রাজপুত্র বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ। রাজা বললেন, সাবধান যুবক! খুব সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হও। চেয়ে দেখ ঐ দেয়ালে গাঁথা শত শত রাজপুত্রের মুণ্ড। কথা বলতে না পারলে, তোমারও ঐ পরিণাম। রাজপুত্র জীবনের মায়া ত্যাগ করেই বলল, হ্যাঁ মহারাজ আমি প্রস্তুত।

অতঃপর রাজা এক পরিচারিকাকে ডেকে বললেন, এই রাজপুত্রকে রাজকন্যার ঘরে নিয়ে যাও। পরিচারিকার পিছন পিছন রাজপুত্র যেতে লাগল এ ঘর সে ঘর করতে করতে একটি ঘরের সামনে এনে দেখিয়ে দিল, এই ঘরে যান ঘরের বাইরের দরজাটা সোনার। সেটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে রাজপুত্র দেখলে, একটি অপূর্ব সুন্দরী কন্যা সোনার পালঙ্কে মখমলের তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছে। অপূর্ব সাজে সেজেছে লোভনীয় রূপে। দ্যুতি ঠিকরে বেরুচ্ছে যেন রেশমে মোড়া জীবন্ত মণি থেকে রাজপুত্র বললো, আমি এক রাজার ছোট ছেলে। বড় ভাইয়ের দুর্ব্যবহারে আমি গৃহত্যাগ করেছি। আপনি যদি আমায় সাহায্য করেন অর্থাৎ কথা বলেন, তবেই আমার জীবনে পরিবর্তন আসবে নচেৎ মৃত্যুই আমার কাম্য। রাজকন্যা নীরব। তখন রাজপুত্র বললো, আচ্ছা আপনি যদি কথা না বলেন তো, আমি একটা গল্প বলি শুনুন—

এক দেশে সাত বন্ধু ছিল, রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সদাগরপুত্র, কোটালপুত্র প্রভৃতি। সাত বন্ধু মিলে মৃগয়া করতে গেল। যেতে যেতে গভীর অরণ্যে চলে গিয়ে পথ হারিয়ে তারা দিশেহারা হয়ে পড়লো। কিছু দূরে দেখতে পেল এক সুন্দর অট্টালিকা। এগিয়ে গিয়ে দেখলো সেই অট্টালিকার চারিদিকে জল, মাঝখানে ঐ বাড়ি। তারা সকলে সাঁতরে ওপারে গিয়ে উঠল। বাড়ির ভেতর কোন লোকজন নেই, অথচ বাইরে পা ধোবার জল গামছা প্রভৃতি আছে। তারা সকলেই ক্লান্ত। হাত মুখ ধুয়ে ভেতরে প্রবেশ করে দেখলো টেবিলে জলখাবার সাজানো। তারা সকলেই জলযোগ করলো। ক্রমে বেলা বাড়লে ভোজনের প্রয়োজন হল। ভেতরের ঘরে গিয়ে দেখলো সে ঘরে ভাত, ডাল, মাছ মাংস তরি-তরকারি সব মজুত। সকলে পেট ভরে খেয়ে নিল।

রাজপুত্র ঘুরতে ঘুরতে তেতলার ঘরে গিয়ে দেখলো একটি পালঙ্কে ফুটফুটে একটি মেয়ে শুয়ে আছে। মেয়েটি ঘুমিয়ে ছিল, রাজপুত্রের ডাকে সাড়া দিল না। রাজপুত্র সেই খাটে বসে দেখলো দুটো সোনা ও রুপোর কাঠি পড়ে আছে। তাই নিয়ে খেলতে খেলতে একটা মেয়েটার গায়ে পড়তেই মেয়েটা উঠে বসলো। বললো, কে তুমি? রাজপুত্র বললো, আমি রাজপুত্র, আমার সঙ্গে আরও ছয়টি বন্ধু আছে। আমাদের সঙ্গে সাতটা ঘোড়াও আছে। শুনে মেয়েটি বললে, তোমরা পালিয়ে যাও। এটা রাক্ষসের বাড়ি। তোমাদের ভাল করে খাইয়ে দাইয়ে, চর্বি মাংস জমা হলে, একদিন খেয়ে ফেলবে।

আমিও এক দেশের রাজার মেয়ে। আমাকে ধরে এনে রেখেছে তোমাদের মত লোককে ভুলিয়ে রাখবার জন্য। রাজপুত্র বললো, কি করে পালাবো? মেয়েটি বললো, এখন আর পালাবার উপায় নেই। পালাতে গেলেই ওদের মাথায় টনক নড়বে, এসেই ধরে ফেলবে। এ বাড়ির চারিদিকে যে জল আছে সাত হাত চওড়া। তোমরা ঘোড়ায় চড়ে যদি এক লাফে পালাতে পারো, তবে বেঁচে যাবে। ওপারে ওরা যেতে পারবে না।

রাজকন্যা ঘোড়ার লেজটা কেটে দিয়েছে। [পৃষ্ঠা ৩৯২

তখন সকলে ঘোড়া লাফিয়ে দেখলো, কারো ঘোড়া পাঁচ হাত, কারো বা চার হাত লাফায়। এতে তো হবে না। তখন সকলে রোজ ঘোড়ার লাফানো অভ্যেস করতে শুরু করলে। এদিকে রাক্ষসেরা রোজ সন্ধ্যেয় বাড়ি ফেরে মানুষের বেশে। এদের জিজ্ঞাসা করল ঘোড়ায় চড়ে লাফাচ্ছ কেন?

এরা জবাব দিল—আপনারা যেভাবে খাওয়াচ্ছেন, একটু ঘোড়ায় না চড়লে হজম হবে কি করে? রাক্ষসেরা হেসে বললো, তা বটে, তা বটে।

এইভাবে রোজ ঘোড়ায় চড়ে লাফানো অভ্যাস করতে করতে দেখা গেল, সকলের ঘোড়া সাত হাত লাফাচ্ছে, কিন্তু রাজপুত্রের ঘোড়া ছ'হাতের বেশী লাফাচ্ছে না। সব বন্ধুরা চিন্তায় পড়লো। কি করা যায়? আর দেরি করাও সমীচীন নয়। কোন্ দিন বলতে খেয়ে ফেলবে। অবশেষে স্থির হল, যা থাকে কপালে আজই পালাতে হবে। সকলেই তৈরী হল, রাজপুত্রও। কিন্তু রাজপুত্রের ঘোড়া টেনেটুনে সাড়ে ছ'হাত পর্যন্ত লাফাচ্ছে। তাইতেই একদিন সকলে পালাবার জন্য তৈরী হল। সকলে যখন ঘোড়ায় চড়েছে, সেই মেয়েটি রাজপুত্রকে বললো, আমায় তুমি নিয়ে চলো। কারণ তোমরা চলে গেলে রাক্ষসেরা ভাববে আমিই তোমাদের পালাতে সাহায্য করেছি। তখন আমাকে খেয়ে ফেলবে।

রাজপুত্রের এ ক'দিন মেলামেশাতে রাজকন্যার ওপর তার একটু মায়া পড়ে গিয়েছিল। সুতরাং রাজপুত্র তার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলো না, তাকে ঘোড়ার পিছনে বসিয়ে নিল। একে তো মাত্র ঘোড়া ছ'হাত লাফায়; তার ওপর দুজনে বসেছে। আর দেখতে হবে না। সকল বন্ধু নিষেধ করলো, কিন্তু রাজপুত্র বললে, না, আমি একে না নিয়ে যাবো না।

সকলের ঘোড়া লাফিয়ে গেল, রাজপুত্রের ঘোড়া লাফাতে পারছে না। এদিকে রাক্ষসদের টনক নড়েছে—তারা হাঁউ মাউ খাঁউ করতে করতে দৌড়ে এসে যেই রাজপুত্র লাফিয়েছে, অমনি ঘোড়ার লেজ ধরে ফেলেছে। রাজকন্যা ক্ষিপ্রগতিতে রাজপুত্রের কোষ থেকে তরোয়াল বার করে ঘোড়ার লেজটা কেটে দিয়েছে। লেজ কেটে দেওয়াতে ঘোড়া সাত হাতের জায়গায় আট হাত লাফিয়েছে। তারপরে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। অনেক দূর দৌড়ে যাওয়ার পরে, যখন নিরাপদ জায়গায় এসে পড়েছে, তখন সকলে একটু বিশ্রাম নিল। আবার যখন রওনা হচ্ছে তখন সব বন্ধুরা বললো, ভাই রাজপুত্র তুমি এ মেয়েকে সঙ্গে নিও না। কারণ এ-ও হয়তো রাক্ষসী। রাজপুত্র বললে, না, একে আমি ছাড়বো না। তখন বন্ধুরা বললে, তবে তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে পাবে না। রাজপুত্র তখন নিরুপায় হয়ে বাঁ হাত দিয়ে পেছনদিকে মেয়েটাকে ঘোড়া থেকে ঠেলে ফেলে দিল। চুক্-চুক্-চুক করে একটা শব্দ হল, মেয়েটাও সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে গেল। সে কি! কোথায় গেল? তখন বন্ধুরা বললে, দেখলে ও রাক্ষসী ছিল। শীগ্‌গির চলে এস। রাজপুত্র বললে, না ভাই তোমরা যাও, আমি যাবো না। আমি ওকে না পেলে বাঁচবো না।

তখন থেকে রাজপুত্রের মুখের বুলি হল, 'এই ছিল, কোথায় গেল?' এইরূপে পাগলের মত কিছুদিন ঘুরে ঘুরে অবশেষে সমুদ্রের ধারে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে এসে হাজির। রাজপুত্র সন্ন্যাসীর কাছে সব ঘটনা খুলে বলে তাঁর পা জড়িয়ে ধরলো, বলল, বাবা আমার কি উপায় হবে? কি করে তার দেখা পাবো? সন্ন্যাসী বললেন, বৎস দেখা তুমি তার পাবে, তবে কিছু কষ্ট স্বীকার করতে হবে। একমাস মাত্র একবার সূর্যাস্তের পরে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করতে হবে। তৃণশয্যায় শয়ন করতে হবে। ও মেয়েটি রাক্ষসী নয়, পরী। ওরা চার বোন। প্রত্যেক পূর্ণিমায় সন্ধ্যাবেলা ওরা সদলবলে ঐ যে সমুদ্রতটে শ্বেত পাথরের ঘাট দেখা যাচ্ছে সেখানে কেলি করতে আসে। কিন্তু তারা সংখ্যায় অনেক থাকে—তারা সকলেই সুন্দরী। তার মধ্যে থেকে সেই মেয়েটিকে চিনে নিতে পারবে তো? রাজপুত্র বললো, আজ্ঞে হ্যাঁ, পারবো। আর সমুদয় কষ্ট স্বীকার করতে আমি প্রস্তুত।

এইভাবে রাজপুত্র সন্ন্যাসীর আদেশমত একমাস তাঁর আশ্রমে কাটালো। পূর্ণিমা তিথি এসে গেল। সন্ন্যাসী বললেন, আজ সন্ধ্যাবেলায় সব আসবে। তুমি সোজা চলে গিয়ে ঠিক সেই মেয়েটিকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব ঘোড়া ছুটিয়ে এখানে চলে আসবে। খুব

সাবধান। পিছনে তাকাবে না। সঙ্গীরা নানা প্রলোভন দেখাবে। তবুও পিছন ফিরে দেখবে না। পিছন ফিরে দেখলে তোমার সমূহ বিপদ মনে রাখবে।

পূর্ণিমার রাত্রি। মধুর জ্যোৎস্নায় দশদিক আলোকিত। ঐ দূরে দেখা যায় সমুদ্র-তটে শ্বেতপাথরের বাঁধানো ঘাট। রাজপুত্র প্রস্তুত। এক লাফে ঘোড়ায় উঠে পড়লেন। শুভক্ষণে দুর্গা নাম স্মরণ করে, সন্ন্যাসীর পদধূলি নিয়ে রাজপুত্র রওনা হয়ে পড়লো। নিকটে এসে দেখতে পেল জলপরীরা সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপরে ওপরে নেচে নেচে জলকেলি করছে। রাজপুত্র ঘোড়া থেকে নেমেই (সেই মেয়েটিকে চিনতে দেরি হল না) তৎক্ষণাৎ তাকে কোলে নিয়ে ঘোড়ায় তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দে ছুট্। পিছনে পিছনে জলপরীরা দৌড়ে আসতে আসতে নানারূপ প্রলোভন দেখাতে লাগল—'রাজপুত্র ফিরে দেখ—তুমি ভুল করেছ। যে মেয়েকে খুঁজছো, সে আমাদের কাছে। এই দেখো সে কাঁদছে। ওকে দিয়ে যাও—তোমার পছন্দ করা রাজকন্যাকে নিয়ে যাও, এই নাও মোহরের থলি—ফিরে দেখো।'

রাজপুত্র কোন জবাব না দিয়ে সন্ন্যাসীর আদেশমত পিছনে না তাকিয়ে একেবারে যুগলে আশ্রমে এসে হাজির। অপর তিন ভগ্নীও পিছনে পিছনে এসে হাজির। রাজপুত্রকে বিবাহ করতে আগ্রহী জেনে অপর তিন ভগ্নী অনেক বোঝালেন—নরলোককে বিয়ে করলে অনেক কষ্ট পাবি—এ কাজ করিস না বোন। কিন্তু বোনটি রাজপুত্রকে বিয়ে করবেই ঠিক করেছে। তখন ঐ ভগ্নীরা যাবার সময় একটি আংটি দিয়ে গেল বোনের আঙুলে পরিয়ে। বলে গেল—যদি কখনও আমাদের সাহায্যের দরকার হয়, এই আংটিটা দাঁত দিয়ে কামড়াবি—আমরা তখনই সেখানে এসে হাজির হবো।

সন্ন্যাসী হোমাগ্নি জ্বেলে শাস্ত্রানুযায়ী এদের বিবাহকার্য সম্পন্ন করলেন। উভয়েই ঐ আশ্রমের নিকট পর্ণকুটির তৈরি করে সুখে কালাতিপাত করতে লাগলেন; কিন্তু সে সুখে বাধা পড়লো, রাজকন্যা সন্তানসম্ভবা। সন্ন্যাসী বললেন। বৎস, তোমরা কোন লোকালয়ে যাও। এ অবস্থায় সমাজ জীবনের প্রয়োজনীয়তা আছে। আমি সন্ন্যাসী মানুষ—তোমাদের এ অবস্থায় কোন সাহায্যই করতে পারবো না।

রাজপুত্র রাজকন্যাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে লোকালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হল। কিন্তু কোথায় লোকালয়? অনেক ঘোড়া ছুটিয়েও তার কোন সন্ধান পেলে না। ইতিমধ্যে রাজকন্যার প্রসব বেদনা শুরু হয়ে গেছে। রাজকন্যা বললে, রাজপুত্র, আমি তো আর পারছি না। আমাকে নামিয়ে দাও। রাজপুত্র পক্ষিরাজ ঘোড়াকে জিজ্ঞাসা করলে, এখানে কোন জলের সন্ধান পাচ্ছ কিনা। পক্ষিরাজ কোন উত্তর না দিয়ে আরও জোরে দৌড়াতে লাগল। রাজকন্যা বললো, আর তো পারি না, আমায় এখানেই এই গাছতলায় নামিয়ে দাও।

বাধ্য হয়ে রাজপুত্র সেইখানেই নামিয়ে দিলে। নেমেই রাজকন্যা একটি পুত্র

সন্তান প্রসব করলো। প্রবল শীত ও কাঁপুনি শুরু হল। রাজকন্যা বললো, শীঘ্র আমার জন্য কিছু আগুনের ব্যবস্থা করো। রাজপুত্র ত্বরিতগতিতে ছুটলো আগুনের সন্ধানে। যেতে যেতে বহুদূরে লক্ষ্য করলো কিছু ধোঁয়া। নিশ্চয়ই কোন লোকালয় হবে। আরও জোরে ঘোড়া চালালো। অবশেষে এক লোকালয় দেখা গেল। সে দেশের রাজা সম্প্রতি মারা গেছেন। রাজা-নির্বাচন করার ভার পড়েছে এক হাতির ওপর। হাতি সারারাজ্য ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যার কপালে রাজদণ্ড দেখবে তাকেই শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে এসে সিংহাসনে বসিয়ে দেবে এবং তাকে জনসাধারণ রাজা বলে মেনে নেবে। হঠাৎ রাজপুত্রকে দেখে হাতি এগিয়ে এল। রাজার ছেলে সুতরাং রাজপুত্রের কপালে রাজদণ্ডের চিহ্ন রয়েছে। হাতি অমনি তাকে শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে পিঠে বসালো। রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়ে একেবারে সিংহাসনে বসিয়ে দিল।

রাজবাড়িতে শোরগোল পড়ে গেল। দুন্দুভি বেজে উঠলো। রাজ্যের সব লোক এসে রাজবাড়িতে জমা হল। গান, বাজনা, নাচ, আতসবাজি, বিরাট ভোজের সঙ্গে মহাসমারোহে রাজপুত্রের অভিষেক হয়ে গেল।

রাজপুত্র সিংহাসনে বসে সব ভুলে গেল। সে যে আগুন নিতে এসেছিল, রাজকন্যা পুত্র প্রসব করে গাছতলায় বসে শীতে কাঁপছে—সব ভুলে গেল। এদিকে রাজকন্যা ছেলে কোলে নিয়ে চোখের জলে ভাসছে। হা রাজপুত্র, হা রাজপুত্র তুমি কোথায়? তুমি বলে দিয়ে যাও, আমি এই শিশু নিয়ে এই নির্জন প্রান্তরে কি করবো? কে আমায় দেখবে! কার আশ্রয়ে যাবো? রাজকন্যা কেঁদে কেঁদে সারা—তবু রাজপুত্রের দেখা নেই। আর দেখা পাবে কি করে? রাজপুত্র তো আর রাজপুত্র নেই—এখন সে রাজা হয়েছে, সিংহাসনে বসে আছে। দু পাশে দাঁড়িয়ে সেবাদাসীরা চামর ঝুলিয়ে ব্যাজন করছে—তার কি এখন গাছ তলার ভিখিরি রাজকন্যার কথা মনে আছে? হায় ভগবান! এ তোমার কেমন বিচার?

যাই হোক, গাছতলায় বসে থাকলে তো রাজকন্যার চলবে না! তাকে ছেলে কোলে করে উঠতে হল। দুঃখের যাত্রা শুরু হল। ঘুরতে ঘুরতে সমুদ্রতীরে এসে হাজির হল। দূরে একখানা জাহাজ যাচ্ছিল। রাজকন্যা নিজের শাড়ির আঁচল নিয়ে ওড়াতে লাগলো। জাহাজের পোতাধ্যক্ষের তা নজরে পড়লো। মনে করলো হয়তো কোন লোক জাহাজডুবি হয়ে ভেসে ভেসে ঐখানে উঠেছে। তিনি জাহাজ নিয়ে সেইদিকে এগিয়ে এলেন। জাহাজ তো অত কাছে যেতে পারবে না। কারণ জল কম। সেজন্য ছোট নৌকো পাঠিয়ে দিলেন। সেই নৌকোতে রাজকন্যা তার ছেলে নিয়ে উঠলো। তাদের অবস্থার কথা শুনে পোতাধ্যক্ষ তাড়াতাড়ি তাদের জন্য গরম জল দুধ ওষুধ প্রভৃতির ব্যবস্থা করলেন। একটি কামরায় থাকতে দিলেন। এইভাবে জাহাজেই চলেছে।

'কি সুন্দর গল্প।' রাজকন্যার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। [পৃষ্ঠা ৩৯৬

রাজকন্যা ভাবলে আমি কোথায় যাচ্ছি? আমার পরিণাম কি হবে? এইসব ভাবছে আর কাঁদছে। হঠাৎ তার তিন ভগ্নীর কথা মনে হল। সে তাদের দেওয়া আঙুলের আংটিটা কামড়ালো। তৎক্ষণাৎ তার তিন বোন জাহাজের সেই কামরায় এসে উপস্থিত। তারা এর দুঃখের কাহিনী সব শুনলো। তখনই চলে গেল সেই সন্ন্যাসীর কাছে। সন্ন্যাসী সব শুনে ধ্যানে বসলেন। তিনি ধ্যানে সব জানতে পারলেন। তিনি বললেন, সে রাজপুত্র এখন রাজা হয়ে বসেছে। অমুক দেশের রাজা। তার সঙ্গে এখনই তোমরা দেখা করে সব ঘটনা বলো। পরীরা বললো, সব ঘটনা শোনবার পরেও কি তিনি আমার বোনকে নিতে আসবেন? সন্ন্যাসী বললেন, নিশ্চয়ই আসবে। পরীরা বললো—তবে এতদিন আসেনি কেন? সন্ন্যাসী বললেন, হাতি শুঁড়ে করে নিয়ে যেই সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছে, অমনি পূর্ব স্মৃতি সব ভুলে গেছে। তাকে তোমরা গিয়ে এখনই সব মনে করিয়ে দাও। পরীরা বললে, এই রাত্রেই? সন্ন্যাসী বললেন, নিশ্চয়ই।

গভীর রাত্রে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় রাজপুত্র ঘুমে অচেতন। 'রাজপুত্র!' 'রাজপুত্র!' এই ডাক শুনে রাজপুত্র চমকে উঠলেন। ঘুম ভেঙে গেল। জিজ্ঞাসা করলেন, কে?

আমরা তিনবোন পরী। আমাদের ছোট বোনকে বিয়ে করলেন। পরে সন্ন্যাসীর আশ্রম থেকে নিয়ে এলেন। গাছতলায় সে পুত্রসন্তান প্রসব করলো। আপনি আগুন আনতে গিয়ে আর ফিরলেন না।

রাজপুত্রের সব মনে পড়লো। চিৎকার করে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব মনে পড়েছে, বলুন তারা কোথায় ? শীঘ্র বলুন।

—সাগরিকা জাহাজ যাচ্ছে সামনের সমুদ্রের ওপর দিয়ে, তার ১৪নং কামরায় তোমার স্ত্রী আছে। এই বলে পরীরা অন্তর্ধান হল। রাজপুত্র তখনই উঠে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করলেন। এক এক বন্দরে যান আর জানতে পারেন, এইমাত্র বন্দর ছেড়ে গেছে। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে সেই জাহাজ ধরতে পারলেন। পাঠকদের হয়তো মনে আছে—এ গল্পটি রাজপুত্র সেই রাজকন্যাকে শোনাচ্ছেন যিনি কথা বলবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন।

যাই হোক, জাহাজে উঠে রাজপুত্র ১নং ২নং করতে করতে দেখতে দেখতে ১৪নং ঘরের সামনে পৌঁছলেন। দরজা খুলতেই দেখলেন সুন্দর ফুটফুটে ছেলে কোলে করে রাজকন্যা বসে আছে।

'কি সুন্দর গল্প।' এই কথাটি যে রাজকন্যাটি তন্ময় হয়ে এই গল্প শুনছিলেন তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

আর যায় কোথা! ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, রাজকন্যা কথা কয়ে ফেলেছেন। রাজবাড়িতে উৎসবের বাজনা বেজে উঠলো। এই রাজপুত্রের সঙ্গে রাজার একমাত্র কন্যার বিয়ে হয়ে গেল।

অদৃশ্য হওয়া

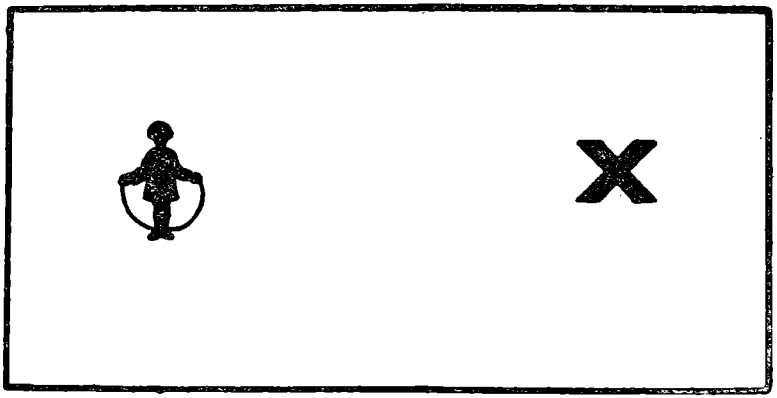

ছবিটা হাতে ধরে হাতটা সামনে সোজা বাড়িয়ে ধর। তারপর ডানচোখ বুজে বাঁ-চোখ দিয়ে X চিহ্নটির দিকে চেয়ে থাক। এইবার ধীরে ধীরে হাতটা সোজা চোখের দিকে নিয়ে এস। ছবিটা কাছাকাছি এলে বাঁদিকের স্কিপিং করা মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে যাবে।

এতে বুঝতে পারবে দৃষ্টির ব্যাস কতটা।

● বিদেশী গল্প

এক জাহাজ ভূত

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

সাতানব্বই সালের সেই বড় ঝড়টার কথা বলছি গো! আমার শুয়োরের খোঁয়াড়ে চালা ছিল বিচিলির। বিলকুল উড়ে গিয়ে পড়ল ল্যাম্‌পোর্ট বিধবার বাগানে। ঝড়ের পরে আমি বেড়ার এপার থেকে মাথা বাড়িয়ে ব্যাপারখানা দেখছি, বিধবাটা তেড়ে এল। ন্যাস্‌টারশিয়ামের লতাগুলো চাপা পড়েছে দেখে তার মেজাজ ছিল বিগড়ে। এমনভাবে আমার তিনকুল উদ্ধার করতে লেগে গেল, যেন ঝড়টা আমিই ফর্মাইস দিয়ে এনেছি ফেয়ারফিল্ড গাঁয়ে।

ওর সঙ্গে গলাবাজি করব পাল্লা দিয়ে, এমন গলা ভগবান আমায় দেননি। সুতরাং আপনমনে গজগজ করতে করতে আমি সরাইখানার দিকে পা বাড়ালাম। সেই যে 'আঙ্গুর ঝোপের শেয়াল' নাম সরাইটার। ল্যাম্‌পোর্ট-মহিলাটির অবিবেচনার কথা সবে সেখানে ফেঁদে বসেছি, সরাইওয়ালা হেসে বলল—"কালকের ঝড়ের কথা ত? বলো না, বলো না! আমার ত মবলগ গচ্চা যেতে বসেছে ওর দরুন।"

"কী? তোমার আবার কী হল?"—প্রশ্ন করলাম কাজে কাজেই, "আর গচ্চা যেতে বসেছে বলে অত হাসিই বা কেন? এতকাল ত জেনেছি, লোকসানের মুখ দেখতে হলে লোকে না হেসে কাঁদে বরং।"

"আমিও কাঁদব, যথাসময়ে নিশ্চয়ই কাঁদব!" বলল সরাইওয়ালা—"উপস্থিত হেসে নিই একটু। হাসির ব্যাপার একটা হয়েছে যখন, হেসে নিই যতক্ষণ পারি। তোমার ত বাপু, উড়েছে শুধু শুয়োরের ঘরের চালাখানি, দেখ গিয়ে আমার বাগানখানা একবার। গোটা জাহাজ একখানা উড়িয়ে এনেছে, আমার অন্ততঃ পঞ্চাশটা শালগমের দফা নিকেশ করে।"

"জা—হাজ উড়িয়ে এনেছে?"—কথা বলতে গিয়ে হাঁ করে ফেললাম আমি।

"বিশ্বাস হচ্ছে না?"—সরাইওয়ালা ক্ষুণ্ণই হল যেন—"চল, চর্মচক্ষে দেখে আসবে চল। পেল্লায় জাহাজ। মিশকালো জাহাজ। কামান-বন্দুকে সাজানো জাহাজ। আমার শালগম ক্ষেতের অর্ধেকটা চেপে বসে আছে, ডবল নোঙ্গর ফেলে। বলছি ত, পঞ্চাশটা শালগম অন্ততঃ বরবাদ গেল আমার। অথচ চাষে লোকসান হলে বউ এমন মন খারাপ করে! সে খবর পায়নি এখনো। যখন পাবে, এঃ, আজ বোধহয় আর বরাতে লাঞ্চ নেই—"

কথা কইতে কইতে সরাইওয়ালা ঝাঁপ বন্ধ করেছে হোটেলের। কারণ আমি ছাড়া অন্য খদ্দের কেউ নেই এখন। গাঁয়ের গেরস্তরা সবাই ঘরের কাজে ব্যস্ত। কেউ চালে টালি বসাচ্ছে, কেউ ভাঙা বেড়া মেরামত করছে। ঝাঁপ বন্ধ করে সে আমায় নিয়ে চলল তার খামারে। বেশী দূর ত নয়, গলি দিয়ে গলি দিয়ে মিনিট পাঁচেকের পথ মাত্র।

যা বলেছে, একবর্ণও বাড়িয়ে বলেনি বেচারী। জলজ্যান্ত জাহাজই একখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে বটে। এমন সেকেলে ঢংএর জাহাজ, যা গত তিনশো বছরের ভিতর একখানাও কেউ দেখেনি কোন সমুদ্রে। খুঁটিনাটি সবই ঠিক ঠিক বলেছে, মিশকালো রং, কামান বন্দুক, ডবল নোঙ্গর। "বেশ মজবুদ চেহারা কিন্তু জাহাজটার"—বললাম আমি।

"পাক্কা দুশো টন"—নিশ্বাস ফেলল সরাইওয়ালা—"ফেয়ারফিল্ডে যত ঘোড়া আছে, যত মানুষ আছে, সবই একসাথে কাঁধ লাগায় যদি, তবু এ জাহাজকে ঠেলে বার করতে পারবে না, আমার শালগম ক্ষেত থেকে।"

"ঘোড়া আর মানুষ! না, তারা পারবে না"—স্বীকার করলাম আমি—"কিন্তু ভূতেরাও যদি জোটে তাদের সঙ্গে? এ-গাঁয়ে ভূতের সংখ্যা ত মানুষের চেয়ে বেশী!"

"তা বেশী"—সরাইওয়ালা সায় দিতে বাধ্য হয়—"কিন্তু তারা কি আর জাতভাইদের ঠাঁইনাড়া করতে রাজী হবে? ও জাহাজও ত ভূতের!"

"কিসে বুঝলে?"—আমি আশ্বাস দিতে চাই, না চেপে ধরতে চাই ওকে—তা নিজেই ভাল বুঝি না—"ঝড়ে ঘর থেকে চাল উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। আর সমুদ্র থেকে জাহাজ উড়িয়ে আনতে পারে না? খুব পারে। তেমন জোরালো ঝড় হলেই পারে। কাল অত বড় ঝড় যদি না হয়ে যেত, তা হলে অবিশ্যি মানতেই হবে যে ভূতেই ওটা এনেছে, ভূতেরই ওটা জাহাজ।"

কথাবার্তা চলেছে আমাদের, এমন সময় ডেক-এ একটা শব্দ শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি, কেবিন থেকে একটা মানুষ বেরুলো, আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল বেশ শান্তভাবেই। লোকটার পোশাকের রংও জাহাজের মতই কালো, তবে তার উপর সোনালী লেস বসানো জায়গায় জায়গায়, যদিও সে লেস পুরোনো হতে হতে মরচে ধরে গিয়েছে। কোমর থেকে আবার তরোয়ালও ঝুলছে তার। পিতলের খাপে ঢাকা মস্ত তলোয়ার একখানা।

বেশ ভদ্রভাবেই লোকটি বলল—"আমি হচ্ছি কাপ্তেন বার্থোলোমিও রবার্ট। এসেছি কিছু নতুন লোক যোগাড় করতে, তা তাদের সৈন্যই বলুন আর নাবিকই বলুন। বন্দর থেকে অনেক দূর এসে পড়েছি, কী বলেন?"

"বন্দর?"—সরাইওয়ালা বলে উঠল—"সমুদ্র ত পঞ্চাশ মাইল এখান থেকে!"

কাপ্তেন রবার্ট একটুও দমল না এ কথা শুনে—"অত দূর? তা যাকগে, কিছু আসবে যাবে না তাতে।"

তার মানে? এইখানেই শিকড় গেড়ে বসে থাকা, নাকি? সরাইওয়ালার মেজাজ গরম হয়ে উঠছে—"দেখুন মশাই, আমার জমিতে এসে বসেছেন, তা বসুন। মানুষের কাছেই মানুষ যায়। এমন কি, যারা এককালে মানুষ ছিল, এখন আর নেই, যায় তারাও। এসেছেন, নোঙ্গর ফেলে বসেছেন, কিছুই বলছি নে আমি তাতে। কিন্তু ধরুন, এটা আমার শালগমের ক্ষেত, লোনা জলের দরিয়া নয়। ঐ শালগমগুলো বেচে দু-পয়সা ঘরে আনার মতলব ছিল আমার বউয়ের।"

কাপ্তেন একটা ব্রুচ ছুড়ে ফেলে দিল সরাইওয়ালার পায়ের উপর।

কাপ্তেন পকেট থেকে একটা সোনার নস্যিদানি বার করল। এক টিপ নস্যি তা থেকে নিয়ে নাকে পুরল। তারপর হাত আর নাক দুটোই রেশমী রুমাল দিয়ে ঝাড়তে লাগল পুরোদস্তুর শহুরে কায়দায়। তারপর সে বলল—"মাত্র ত কয়েকটা দিন আমি থাকছি এখানে। তার দরুন কিছু নজরানা দিলে ভদ্রমহিলা যদি খুশী হন, আমার তা দিতে আপত্তি নেই!"

এই বলে কাপ্তেন কোটের গলা থেকে মস্ত একটা সোনার ব্রুচ খুলে নিল, আর বিনা বাক্যব্যয়ে তা ছুড়ে ফেলে দিল সরাইওয়ালার পায়ের উপর। সে লোকটা ত লজ্জায় মরে একেবারে। ব্রুচটা তুলে নিয়ে ভারী কিন্তু ভাবে বলল—"বউ যে গয়না ভালবাসে না, এমন কথা পারি না বলতে। কিন্তু বিবেচনা করুন, আধবস্তা শালগমের আর কত দাম হত? তার দরুন এমন দামী একটা—"

কাপ্তেন বেদম হেসে উঠল—"আরে মশাই, ঠেকে গেছি বিপদে। আপনাদের তোয়াজ না করলে চলে কখনো?"—এই বলেই সে মিলিটারি কায়দায় পিছন ফিরল আর কুচ-কাওয়াজের ভঙ্গীতে পা ফেলে ফেলে ঢুকল গিয়ে কেবিনে। আর আমরা? গলিপথ ধরে

সরাইয়ের দিকে ফিরছি যখন, বন্ধু বলল—"ঝড়টা আমার পয় খুলে দিয়েছে, তাতে ভুল নেই। বউ কী খুশীই হবে!"

ওকে সরাইখানায় রেখে আমি বাড়ির পথ ধরলাম। পয় আমার কিন্তু খোলেনি। টম ল্যাম্‌পোর্ট যতদিন বেঁচে ছিল, সদ্ভাবই রেখেছিল আমার সঙ্গে। কাল করলে মানুষটা মরে গিয়ে। ওর বিধবা বউটা দিন দিন মারমুখী হয়ে উঠছে যেন। এমন কি, আমার বেড়ালটা যদি ওর বাড়িতে কখনো গিয়েছে ত তুলকালাম ঝগড়া। অবশ্য, সে বেড়াল যে আমার বেড়াল কী করে হল, তা আমি কোনদিন বুঝতে পারিনি। আমার বাড়িতে সে জন্মায়নি, তার মা কোনদিন ত্রিরাত্রি বাস করেনি আমার বাড়িতে। সে ঘোরে ফেরে পাড়ায় পাড়ায়, ভোজনং যত্র কুত্রাপি শয়নং হট্টমন্দিরে গোছের। তবে ঐ এক কথা, পাড়া থেকে তাকে যদি ল্যাম্‌পোর্ট-বাড়িতে ঢুকতে হয়, যেতে হয় আমার বাড়ির উপর দিয়ে। সেই সুবাদেই দু'দে বিধবাটা ওকে আমার বেড়াল বলে জাহির করতে চায়।

থাক সে দুঃখের কথা। সমূহ ঝামেলা সামনে। চালাখানা তুলে আনা চাই ওর বাগান থেকে। সেইটাই কঠিন কাজ। তারপর চালাখানায় চাট্টি নতুন বিচালি গুঁজে তাকে আবার শুয়োরের খোঁয়াড়ের মাথায় যথাপূর্ব স্থাপন করা চাই। সেটা কাজ এমন কঠিন নয় কিছু। আগেরটার তুলনায় পরেরটা জলবৎ তরল। ঐ দজ্জাল মেয়েমানুষ, যার মুখে কোন কথাই আটকায় না, তার বাগানে ঢুকবার কথা তার সামনে তুলবই যে কেমন করে, তা বুঝতে পারছি না।

এ গাঁয়ে যারা মরে, তারা মরেও মরে না অনেকেই। ভূত হয়ে ফিরে আসে। নিজের বাড়িতেই আসে অবশ্য, তবে শোবার ঘরে আর শোয় না। কোন ভাঙ্গা-চোরা চিলের কুঠুরি থাকে যদি, আড্ডা নেয় সেখানেই। আর তা যদি না হল, কোন গাছের ডালে। সেখান থেকেই তারা সংসারের সঙ্গে ষোলআনা যোগাযোগ বজায় রাখে, ছোট বড় সব কথাতেই নাক গলায়। অনেক লোকই এই রকমটা করে, কিন্তু করেনি আমার ভূতপূর্ব পড়শী টম ল্যাম্‌পোর্ট।

কেন যে করেনি, তাও বুঝতে পারি বই কি! জ্যান্ত থাকতে সে কম যন্ত্রণা পায়নি, ঐ বউয়ের অত্যাচারে। মরে যদি বা রেহাই পেয়েছে, ভূত হয়ে আবার সে কি এখানেই ফিরে আসবে, আর এক কিস্তি যন্ত্রণা সইবার জন্য? কদাচ না, ধড়ে এক রত্তি বুদ্ধি থাকলে টম ল্যাম্‌পোর্ট তা কখনও করবে না। করেনি এযাবৎ। ভূত অবশ্য হয়েছে। কে আর না হয়? কিন্তু হয়ে থাকলেও এ গাঁয়ে মুখ আর দেখায়নি টম। কিন্তু টম মুখ দেখায়নি যদিও, গাঁয়ের প্রত্যেকটা হ্যারি, ডিক, ডবসন তা দেখিয়েছে। বিকালে কবর দিয়ে এসেছি, রাত নয়টার ভিতরেই দেখিয়েছে। কবরের সাধ্য কী ওদের আটকে রাখার? দেহটাকেই

হয় ধরে রাখে যাহোক করে, তা ছাড়া বাদবাকী আর সব কিছু সঙ্গে নিয়ে হ্যারি-ডিক-টমেরা সটকে পড়ে কবরখানার বাইরে, গাছের ডালে নয় ত খেলার মাঠে নাচে গায় হুড়োহুড় করে মনের আনন্দে।

ফেয়ারফিল্ড গাঁয়ের ইতিহাস যতদিন থেকে পাওয়া যায়, ততদিনই এই রেওয়াজই চলছে এখানে। শিকারের মরসুম যখন আসে, ফী বছরই রাতের বেলায় তিন-তিনটে শিকারী দল বেরুতে দেখি আমরা। একটা তালুকদার বাড়ি থেকে, একটা অ্যাটকিনসন খামার থেকে, আর একটা যে কোথা থেকে, তা কেউ ধরতে পারেনি আজও। বলা বাহুল্য, ঐ তালুকদার বাড়ি আর অ্যাটকিনসন খামার সবই ভেঙ্গে চুরে জঞ্জাল হয়ে রয়েছে, আজ কত কাল তা কে জানে। মানুষও নেই সেখানে, কুকুরও নেই। এই যারা শেয়াল-শিকারে সেজে বেরোয় সেখান থেকে, তারা সবাই ভূত। মানুষেরাও, কুকুরেরাও। ঘরে ঘরে মশাই এই ব্যাপার। কামার হিকরি সেবারে মৌফতে একটা মোহর পেয়ে গেল, সে গল্প না জানে কে? ওর বাড়িতে নীচের ঘরে কামারশালা, উপরে ও থাকে। এখন রোজ রাত্রেই ও টের পায়, নীচে দমাদ্দম হাতুড়ি পিটছে, কেউ কেউ বা খুট খুট করে ঘোড়ার পায়ে নাল পরাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে সেই ঘোড়া-ভূতেরা চিঁ হিঁহিঁ করে ডেকেও উঠছে। হিকরি ঘুমোচ্ছে তাদের মাথার উপরে অকাতরে। তার ভয় পাবার কিছু নেই, কারণ নীচে কাজ করছে যে কামার, সেও এক ভূতপূর্ব হিকরি, বর্তমান হিকরির ঠাকুর্দার বাবা। কামারশালের যন্ত্রপাতি নষ্ট করবে না বাবার ঠাকুর্দা, তা বিলক্ষণ জানে বর্তমান হিকরি।

একদিন হল ভারী রগড়। বেজায় মাথা ধরেছে হিকরির, ঘুমোতে পারছে না একদম। তার উপরে, নীচে কাজ চলছে পুরোদমে। খুট খুট ডুং ডুং ধাড়াং ধাড়াং। যতক্ষণ পারল, সহ্য করল হিকরি। তারপরে হেঁকে উঠল—"আস্তে, আ-স্তে বাবার ঠাকুর্দা, তা নইলে কাল থেকে আমি হাতুড়ি-মাতুড়ি সব উপরে নিয়ে আসব, তা বলে দিচ্ছি।"

আওয়াজগুলো তার পরে একটু কমেই গেল বোধহয়। অন্ততঃ হিকরি আর কিছু টের পায়নি, সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। পরদিন সকালবেলায় কিন্তু নীচে নেমেই সে তুড়ি-লাফ খেতে লাগল। নেয়াইয়ের উপরে রয়েছে চকচকে একটা গিনি। ঠাকুর্দার বাবা নাতির ব্যাটাকে ঘুষ দিয়ে গিয়েছে যাতে রাতের কাজে বাগড়া না পড়ে তার।

সেই গিনি? হিকরি তা না দেখিয়েছে কাকে? যদি না দেখে থাকে কেউ, যাক না, কামারশালে গিয়ে দেখে আসুক! হিকরি ঘড়ির চেনে এঁটে রেখেছে গিনিটা।

এ ত গেল রাতের কথা। দিনের বেলাই কি ওদের পায়ে বেড়ি দিতে পারে না কি কেউ? খবর পেলাম সেবার, আমাদেরই নোয়েল মারা গিয়েছে লড়াইয়ে। গাঁয়ের

আরও ছেলেরা ছিল পলটনে, নোয়েলের কাটা মুণ্ডুটা খুঁজে পেয়েছিল, সেটা কবরও দিয়েছিল তারা। ধড়টা পায়নি। কী হল তার, জানেও না কেউ।

সেদিন হল কী, রাস্তার ধারের বড় ইঁদারা থেকে জল আনতে গেছি। বেলা তখন কত হবে? এই নয়টা কি সাড়ে দশটা। দেখি—ইঁদারার চারধারে পাকা বেদী আছে না উঁচু করে গাঁথা?—দেখি, সেই বেদীর উপরে পা ঝুলিয়ে বসে আছে মুণ্ডুকাটা নোয়েল। কী করে জানলাম—সে নোয়েল? অকাট্য প্রমাণ ছিল মশাই। নোয়েলের ডান পায়ে আঙ্গুল ছিল ছয়টা। এই কাটামুণ্ডু কবন্ধের ডান পায়ের আঙ্গুল আমি একটা একটা করে গুনে দেখেছিলাম, ছয়টা হয়েছিল।

বসে আছে নোয়েল, পা দোলাচ্ছে আরাম করে, উঠবার চাড় নেই। মাথা যদি থাকত কাঁধের উপর, রোদ লেগে তা গরম হতে পারত। উঠে পড়বার তাগিদ হত ওর। মাথা না থাকার দরুন ঠাণ্ডা হয়ে বহাল-তবিয়তে ও বসে আছে, উঠবে কেন?

পাড়ার বাচ্চা এসে জুটেছে গোটাকতক। জল নিতে আসেনি তারা, মনের আনন্দে খেলা করছে নোয়েলের আশেপাশেই। নোয়েল যদি পা একটু জোরে দোলায়, এক্ষুণি ঠোক্কর লাগে কেটি র‍্যামেজের মাথায়। তা অবশ্য সে দোলাবে না জানি, নোয়েল বাচ্চাদের ভালবাসত এক সময়।

সিঁড়ি জুড়ে বসে আছে নোয়েল, উঁচু বেদীতে উঠতে আমার কষ্ট হল খুব। তা হোক, কী আর করা যাবে। দেশের জন্য মুণ্ডুটা দিয়ে এল যে লোক, তার একটা খাতির আছে ত। আমি বলতে পারলাম না যে "তুই উঠে যা নোয়েল, আমি জল নেব—"

হ্যাঁ, এই রকমই জায়গা আমাদের ফেয়ারফিল্ড। ভূতে-মানুষে দিব্যি মিলেমিশে বাস করি এখানে। লণ্ডনের কোন লোক বিশ্বাস করছে একথা? কখ্খনো না। জানি তা। তাই আমাদের গাঁয়ের অবস্থানটা যে ঠিক কোথায়, ঐটি তাদের বলছি না কিছুতেই। তবে, এই পর্যন্ত বলতে বাধা নেই, কাছেপিঠেই আছি আমরা। লণ্ডন থেকে সরকারী সড়ক ধরে সোজা যদি চলে যাও পোর্টসমাউথের দিকে, মাঝ পথেই পাশ কাটিয়ে যাবে ফেয়ার-ফিল্ডের। দেখতে অবশ্য পাবে না। একটা জঙ্গলের আড়াল আছে ঐ খানটাতে।

* * *

কয়েকদিন গেল। অশান্তিতেই গেল। ল্যাম্‌পোর্ট স্ত্রীলোকটার কবল থেকে শুয়োরের ঘরের চাল উদ্ধার করতে পারিনি। ও দেবে না। ও মজা দেখছে। বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়েছি, "মিসেস ল্যাম্‌পোর্ট, মিসেস ল্যাম্‌লোর্ট" বলে বলে। সে জবাব দেয়নি। ঘুরে গিয়ে সদরে কড়া নেড়েছি, সাড়া পাইনি। মজা দেখছে! ইতিমধ্যে ন্যাসটারসিয়ামের একটা নতুন কেয়ারি সে বানিয়ে ফেলার চেষ্টায় আছে। মাটি কুপিয়েছে,

দেখেছি। কত বড় ফিচেল মেয়েমানুষ বুঝুন মশাই। তৈরী কেয়ারিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তা হোক, তবু নিরীহ পড়শীর চালাখানা ফেরত দেবে না। নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রাভঙ্গ আর কি।

আমি আছি আমার নিজস্ব ঘরোয়া ঝামেলায় বিব্রত। ওদিকে ফেয়ারফিল্ডে কিন্তু আলোড়ন উঠেছে একটা, ঐ ভূতুড়ে জাহাজ নিয়ে। ওর সেই কাপ্তেন ভদ্রলোক নাকি—

কিন্তু কথাটা গোড়া থেকে বলাই ভাল। সরাইখানায় দেখা হল মুচি লিণ্টনের সঙ্গে। সেই যে সরাইখানাটি আমাদের, গাঁয়ের এক ও অদ্বিতীয় সরাই—"আঙ্গুর ঝোপে শেয়াল" যার নাম।

আমাকে দেখেই লিণ্টন জিজ্ঞাসা করল—"কয়েকদিন আসনি বুঝি ?"

সত্যিই আসিনি কয়েকদিন। শুয়োরের ঘরটা নতুন করে ঢাকতে হবে। কোথায় কাঠ, কোথায় গজাল, কোথায় বা বিচালি এই বে-মরসুমে, তারই ধান্ধায় ঘুরেছি স্থানে অস্থানে। কিন্তু গুছিয়ে-গাছিয়ে সে কৈফিয়তটা মুচি ভাইয়ের কাছে পেশ করবার সময় আমি পেলাম না। পহেলা প্রশ্নের পিঠ পিঠ এসে পড়ল তার দুসরা প্রশ্ন—"আমার সেই চারপুরুষ আগেকার ছোকরা জেঠার কথা জানত ?"

"জোশুয়া ? সেই শিষ্টশান্ত ছোকরা ? তাকে জানব না কেন ?"—বললাম আমি।

কথা সত্যি। কেন জানব না ? চর্মচক্ষে তাকে দেখিনি, কিন্তু সে যে আছে, সেকথা শুনে আসছি জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই। প্রায় একশো বছর আগে সে মরেছে, কিন্তু একদিনের তরেও বাড়ি ছাড়া হয়নি। ছোকরা বয়সে মারা গিয়েছিল, কাজেই ভৌতিক মূর্তিও তার ছোকরার মতই রয়ে গিয়েছে বরাবর। অত্যন্ত সুবোধ সুশীল ছেলে, গাঁয়ের ভিতর জ্যান্ত ছেলেদেরও উপদেশ দেয় অভিভাবকেরা—"দেখে শেখো, জোশুয়ার মত ভাল ছেলে দেখতে চাই তোমাকে।"

সত্যিই আদর্শ তরুণ ঐ জোশুয়া। রাত নয়টার ভিতরে ফিরবে, গুটিগুটি চলে যাবে তার নিজের ঘরে। সিঁড়ির মাথায় চিলে কুঠুরিটাই তার নিজস্ব স্থান। একশো বছর ধরে ঐ ঘরই অধিষ্ঠান তার। কোন ঝামেলায় নেই, কোন উৎপাত করে না। সে যে আছে—তা বাড়ির লোকে ভুলেই যেত হয়ত, যদি না কাঠের সিঁড়িতে রাত্রিবেলায় এক একদিন ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ শোনা যেত তার ওঠানামার, আর যদি না পিছনের বাগানে ডাল ধরে তাকে দোল খেতে দেখা যেত মাঝে মাঝে দিনের বেলায়।

এহেন জোশুয়ার কথা আজ লিণ্টন হঠাৎ তুলছে কেন, এমন তেতো গলায় ?

"জোশুয়া ? সেই শিষ্টশান্ত ছোকরা ?"—এইটুকুই শুধু বলেছিলাম আমি—

আর যায় কোথায় ? মুচিভাই ফেটে পড়ল রাগে—"শি-ই-ষ্টো-ও শা-আ-ন্তো ?

ওরে আমার শিষ্ট শান্ত রে! সেদিন আর নেই শ্রীমান জোশুয়ার। এই একশো বছর বাদে বাছুরের শিং গজিয়েছে আজ। এখন শ্রীমান রাত তিনটের আগে বাড়ি ফেরেন না। মদে চুরচুর একদম, চালচলন যেন লাটের মতন। তার দাপাদাপিতে সারা বাড়ির ঘুম ভেঙ্গে যায় সেই ভোর রাত্তিরে।"

আমি ত শুনে অবাক্। "আরে না, না, তাহলে ও অন্য কোন বদ ভূত। জোশুয়া হতেই পারে না ও। ছোকরা ভূতদের মধ্যে জোশুয়ার মত ভদ্র—"

"আর ভদ্র!"—রাগের মধ্যেও দুঃখ জানায় লিণ্টন—"মদে যাকে ধরে, সে আর ভদ্র থাকে কতক্ষণ? তোমাদের এই সরাইওয়ালাই যত নষ্টের মূল। গাঁয়ের সব জোয়ান ভূতকে রোজ দেখতে পাওয়া যায় তার শালগমের ক্ষেতে, ভূতের জাহাজে তাদের নেমন্তন থাকে মদ খাওয়ার। সরাইওয়ালা যদি তার ক্ষেতে ও জাহাজকে নোঙ্গর ফেলতে না দিত—"

তারপরই উদয় হল কশাই এ্যালউইন। তারও নালিশ আছে। একই নালিশ। সেনলাকের লড়াইয়ে মারা পড়েছিল তার কোন্ এক পূর্ব পুরুষ। তারই উপরে অগ্নিশর্মা হয়ে রয়েছে কশাই বন্ধু আমার। "কুত্তার বাচ্ছা, কুত্তীর বাচ্ছা" ছাড়া অন্য কথা নেই তার মুখে। সেনলাকের এই কাটা-সৈনিক মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে যখন, সে নাকি হামেসাই হুংকার ছাড়ে—"ব্রিটন্স নেভার শ্যাল বি স্লেভস্" বলে। জাহাজে নাকি চাকরি পেয়েছে সে—"রুল ব্রিটানিয়া, ব্রিটানিয়া রুল্স্ দ্য ওয়েভস্।"

এর পর থেকে কান খোলা রাখলাম আমি। রোজই নতুন নতুন কাহিনী শুনতে পাই। গাঁয়ের ভূত-সমাজে শক্তসমর্থ পুরুষ যাদের কথা জানতাম, সবাইয়েরই অধঃপতনের কাহিনী। সারারাত ভূতের জাহাজে কাটিয়ে ভোররাত্রে তারা বাড়ি ফেরে, চুর-মাতাল অবস্থায়। ঘরে ঘরে বিপর্যয় কাণ্ড।

সবাই মিলে গঞ্জনা দেয় সরাইওয়ালাকে। সে যদি না ভূতের জাহাজকে ঠাঁই দিত নিজের বাগানে, এই অনর্থ ঘটতেই পারত না। খদ্দের সব চটে যায় দেখে বেচারা একদিন মরিয়া হয়ে হানা দিল গিয়ে বাগানে। আমাকেও নিয়ে গিয়েছিল সঙ্গে, সাহস পায়নি একা যেতে।

কাপ্তেনকে ডেকে সে বলল—"এ তোমার কী রকম ব্যবহার কাপ্তেন! গাঁয়ের ছেলেগুলোকে, তা হোক না তারা ভূত, তবু গাঁয়েরই ত ছেলে। তাদের একধার থেকে মদ ধরিয়ে দিচ্ছ? আমার বউ ব্রুচ ফেরত দিতে চাইবে না, জানি বলেই তোমায় কিছু বলতে পারছি না, তা নইলে এক্ষুণি নোটিশ দিতাম—তুমি আমার বাগান থেকে জাহাজ তুলে নিয়ে যাও বলে।"

কাপ্তেন ঠাণ্ডা হয়ে সব শুনল, তারপর মুচকি হাসল—"মশাই, আর রাগারাগি করবেন না। নোটিশও দিতে হবে না, ব্রুচও আমি ফেরত নেব না। আমার কাজ হয়ে

গিয়েছে। কিছু সৈনিক জোটানোর আমার দরকার ছিল, তাই ঐ লোভানি দিতে হয়েছে—নরক-মহলের এক নম্বর সরাইখানার ঐ সোনালী রম্। তা আমার কাজ হয়ে গিয়েছে, পেয়ে গেছি লোক। আজ রাত্রেই আমি চলে যাব আমার জাহাজ নিয়ে।"

ফিরে এলাম সরাইখানায়। কাপ্তেনের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করিনি আমরা, তাই কাউকে কিছু বলিনি গাঁয়ে। তবে আমি আর সরাইওয়ালা এক সাথেই আছি। রাত্রে কী হয়, তাই দেখবার জন্য বসে আছি সরাইখানায়।

সন্ধ্যা হতে না হতে শুরু হল ঝড় আর বৃষ্টি। আগে এক ঝড়ের রাতেই ঐ ভূতের জাহাজ এসেছিল এ গ্রামে। আজও আবার শুরু হল ঝড়, দেখা যাক জাহাজ উড়ে যায় কিনা এই ঝড়ে পাল তুলে দিয়ে।

আকাশপথে জাহাজটা ভেসে যাচ্ছে আষ্টেপৃষ্ঠে পাল তুলে।

যত রাত বাড়ে, দুর্যোগও বেড়ে চলে। শেষ রাতে জানালা দিয়ে দেখি—সত্যিই সেই কালো জাহাজ বিকট আওয়াজ তুলে আকাশপথে ভেসে যাচ্ছে আষ্টেপৃষ্ঠে পাল তুলে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল বলেই চোখে পড়ল জাহাজখানা। তা না হলে আঁধার আকাশে কালো জাহাজ আড়ালে আড়ালেই উধাও হয়ে যেত।

সরাইওয়ালা নিশ্বাস ফেলল—স্বস্তির নিশ্বাস। তার বাগান খালাস হল এতদিনে। আমিও নিশ্বাস ফেললাম বটে, তবে সেটা দুঃখের। দুঃখ গাঁয়ের ভূতগুলির জন্য। কাপ্তেন তাদের নিয়ে গেল। এ গাঁয়ের আনন্দও ফুরিয়ে গেল তাদের অন্তর্ধানে।

কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবারও একটা সুযোগ আমি পেলাম—রাত ভোর হওয়ার পরে। সরাই থেকে বাড়ি ফিরেই দেখি—কালকের ঝড় মহৎ উপকার করে গিয়েছে আমার। দজ্জাল ল্যাম্‌পোর্ট বিধবাটার বাগান থেকে উড়িয়ে এনে আমার চালাখানাকে আবার শুয়োরের খোঁয়াড়ের মাথায় বসিয়ে দিয়েছে, যথাপূর্বং যথাস্থানং। *

* রিচার্ড মিডলটন-এর "দ্য গোস্ট শিপ" অবলম্বনে।

না, আমরা তোমাকে যেতে দেব না
তোমাকে এখানেই থাকতে হবে

তুমি এখানে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারো, আমাদের কোন অসুবিধা হবে না
ঠিক আছে, আপনারা যখন বলছেন, তখন এই শীতকালটা এখানেই থাকবো

আনন্দ থেকে গেল এবং নানা কাজ-কর্মে তাদের সাহায্যও করতো

আর রাত্রে ঘরের মধ্যেই তাদের সঙ্গে খেলায় মেতে উঠতো আনন্দ।

অবশেষে শীতকাল চলে গেল
এখন আমাকে চলে যেতে হবে।
সে কি, এরই মধ্যে! তুমি আমাদের ভুলে যাবে না তো? আবার কবে দেখা হবে!

আনন্দ চলে গেল
বিদায়, ছোট্ট বন্ধুরা

তোমার পথ চেয়ে বসে রইলাম। যত শীগ্‌গির পারো ফিরে এসো, আনন্দ।
৮

(চলবে)

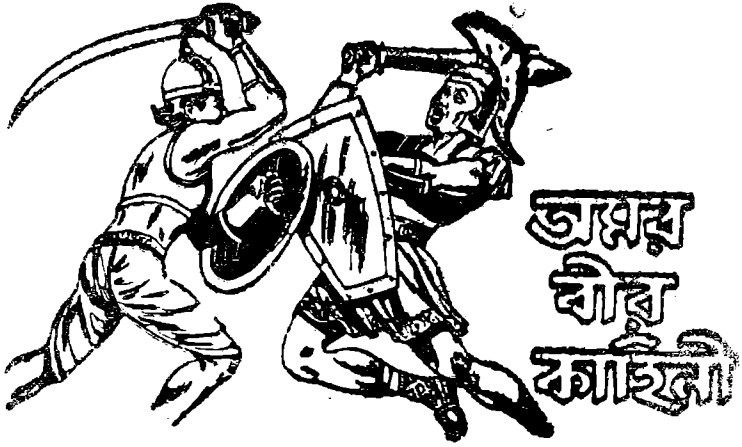

ধর্মরাজ ইল্বল চোল

শ্রীমধুসূদন মজুমদার

আগুন জ্বলেছে বেঙ্কট পর্বতে। গিরিচূড়ায় সাজ-সাজ রব, গিরিপাদমূলে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত সহস্র ধনুর ভৈরবটঙ্কার। যুবরাজ ইল্বল আহ্বান পাঠিয়েছেন দিকে দিগন্তরে। "চল বীর যে আছ যেখানে, সিংহলে চল জয় অভিযানে"।

ইল্বলের এ অহেতুক রণকণ্ডুয়ন নয়। নিছক দিগ্বিজয়-বাসনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি যে প্রতিবেশী সিংহলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছেন, মোটেই নয় তা। রক্তপিপাসা তাঁর সহজাত নয়, প্রকৃতি তাঁর কোমল, স্নেহশীল, মহতে আর ইতরে তিনি সমদর্শী। তবু, একটা দুর্লঙ্ঘ্য কারণে বাধ্য হয়েই তাঁকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়েছে সিংহলনৃপতি মেঘবর্ণের বিরুদ্ধে।

মেঘবর্ণ আর ইল্বল—সতীর্থ। রামেশ্বর তীর্থে সর্বশাস্ত্রবিদ আচার্য বেদভূতির চরণতলে বসে একসাথে দু'জনে পাঠগ্রহণ করেছেন দীর্ঘ ছয় বর্ষকাল। তারপরে, মেঘবর্ণের হল পিতৃবিয়োগ। অধ্যয়ন ছেড়ে তাঁকে দেশে ফিরতে হল, অপরিণত বয়সেই রাজদণ্ড ধারণ করবার জন্য। ইল্বল গুরুগৃহেই রইলেন নানা শাস্ত্রের চর্চায় নিমগ্ন হয়ে।

অবশেষে গুরু একদিন প্রসন্ন হাস্যে বললেন—"পুত্র! আর তোমাকে শেখাবার কিছু নেই আমার। ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে ন্যায়নীতি অর্থশাস্ত্র সব কিছুই পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করেছ তুমি। এইবার গৃহে ফিরে যাও। রাজপুত্র তুমি, রাজকর্তব্য যথাযথ পালনে আত্ম-নিবেশ কর গিয়ে।"

ইল্বল এক অদ্ভুত আবদার করে বসলেন গুরুর কাছে—"তাত! এতদিন যা

শিখলাম আপনার কাছে, তার মূল তত্ত্ব কী, আমায় বলে দিন। জ্ঞানের অরণ্যে দিশাহারা হয়ে রয়েছি আমি। একটি আলোকবর্তিকা আমার হাতে দিয়ে দিন আপনি, যার সাহায্যে সকল সমস্যার সমাধান আমি খুঁজে পাব।"

গুরু এক মুহূর্ত চিন্তা করে তারপর বললেন—"তা যদি বল, তবে এই কথাটি মনে রেখো প্রতি মুহূর্তে। কেউ কারো চেয়ে বড় নয়, কেউ নয় কারো চেয়ে ছোট। আমার ধারণা এইটি স্মরণ রাখলেই কোন সমস্যা আর জটিল বলে তোমার মনে হবে না।"

গুরুকে প্রণাম করে ইল্বল গৃহে চলে গেলেন, দ্বাদশ বৎসর পরে। রামেশ্বরে আশ্রয় নিয়েছিলেন আট বৎসরের বালক, সেখান থেকে আজ যিনি ফিরে এলেন, বিংশ বৎসরের পূর্ণ যুবক তিনি। রূপে গুণে চরিত্র মহিমায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতই সর্বজনের আদর্শ, শত্রুমিত্র সকলের নয়নাভিরাম।

পিতা সোমসিন্ধু উপযুক্ত পুত্রকে কাছে পেয়েই তাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করে দিলেন। প্রশাসনের অধিকাংশ দায়িত্বই অর্পণ করলেন তাঁর করে।

চোল রাজ্যের রাজস্বের এক বৃহৎ অংশই আসে মৎস্য ব্যবসা থেকে। মাছ ধরার জন্য বিশাল নৌবাহিনী আছে। সমুদ্রে সমুদ্রে মাছ ধরে বেড়ায় চোল দেশের ধীবরেরা। এক একটা নৌকা একাদিক্রমে ছয় মাসও বিচরণ করে সাগর-তরঙ্গে নেচে নেচে।

বঙ্গসাগরই চারণক্ষেত্র এইসব ধীবরের। সেতুবন্ধ থেকে উৎকলের উপকূল, যখন যেখানে সুবিধা, অবাধে তারা জাল ফেলে বেড়ায়। অন্য রাজ্যের উপকূলে মাছ ধরলে তার সামান্য কিছু অংশ সেই রাজ্যকে দিয়ে আসতে হয় শুল্ক বাবদ। অন্য কোন বাধা নিষেধ কারও উপরেই কেউ আরোপ করে না।

ভারতের পূর্ব উপকূলেই বরাবর আনাগোনা এদের। দক্ষিণে তারা যায় না। ওটা সিংহলের এলাকা বলেই যে যায় না, তা নয়। রামেশ্বর থেকে শুরু করে সিংহল পর্যন্ত ঐ যে সংকীর্ণ প্রণালীটুকু, ওর জলকে ধীবরেরা তীর্থোদক বলে বিবেচনা করছে যুগ যুগ ধরে। ভগবান রামচন্দ্র ওখানে সেতুবন্ধন করেছিলেন। সে-সেতুর কিছু কিছু অংশ এখনও জলের তলায় বিদ্যমান দেখা যায়। হিংসাবৃত্তি নিয়ে কোন্ ভারতীয় সেখানে যাবে রামনামের মহিমাকে অগ্রাহ্য করে?

যায় না চোল রাজ্যের ধীবরেরা, কিন্তু দৈবের তাড়নায় সেবারে গিয়ে পড়ল। সেতু-বন্ধেরই পূর্ব দিকে, প্রায় দশ ক্রোশ বাহির সমুদ্রে মাছ ধরছিল একটা নৌবহর। নৌকার সংখ্যা তাতে পাঁচশোর মত। মাছ ধরছিল, এমনি সময়ে অতর্কিতে উঠল ঝড়।

তা ঝড়কে বড় একটা ডরায় না এই ধীবরেরা। সমুদ্রে মাছ ধরব, অথচ ঝড়ের মুখে কখনও পড়ব না, এমনটা ত আশা করা চলে না আর। আশা করে না বলেই ঝড়ের সঙ্গে

যুঝবার জন্য তৈরীই থাকে ওরা সর্বদা। যেদিকে ঠেলে নিতে চায় বাতাস, নিয়ে যাক। মাঝির দায়িত্ব শুধু নৌকাকে ভাসিয়ে রাখা জলের ওপরে। ডুবে যাওয়া? না, এসব নৌকা তৈরীই হয় এমন কৌশলে যে ডোবা ব্যাপারটা কদাচিৎই ঘটে। হাজারে একটাও নয়। আর ডুবলই যদি কেউ, সঙ্গে ত আরও শত শত নৌকা আছে। কেউ না কেউ তুলবেই জলশায়ী নৌকার আরোহীদের।

সে যা হোক, ঝড়ে পড়ল পাঁচশো নৌকার একটা বহর, মোড়ল মাঝি থিরুমল গর্গ। পঞ্চাশ বছর ধরে সে সাত সমুদ্দুর চষে বেড়াচ্ছে। ঝড় দেখেছে দুই চার হাজার। ডুবেছে জীবনে একবার মাত্র। না, ডোবা নয়, ভেসে গিয়েছে একবার মাত্র, এইরকম বলাই ঠিক। একাদিক্রমে সাতদিন ঢেউয়ের নাগরদোলায় ভেসেছিল একখানা বৈঠা অবলম্বন করে, উঠেছিল গিয়ে সুবর্ণভূমির এক দ্বীপে।

কিন্তু সে-কথা থাকুক। ঝড় উঠতেই থিরুমল গর্গ হাঁক দিল—সামাল, সামাল। জাল নৌকায় তুলে জেলেরা ঘাঁটি হয়ে বসল, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করার জন্য। ডাঙ্গা পশ্চিমে। ঝড় আসছে উত্তর থেকে। কাজেই ডাঙ্গায় ফেরার কোন আশা আপাততঃ চোখে পড়ছে না।

ঝড় একটানা বয়েই যাচ্ছে। নৌকা ভেসেই চলেছে দক্ষিণে। রামেশ্বরকে ডাইনে রেখে সিংহলের দরিয়ায় গিয়ে পড়ল বহর। ঐ যে দেখা যায় মরকত-শ্যামা বনানী কুন্তলা সিংহলভূমি, পশ্চিম পানে। দূরত্ব? না, দূরত্ব বেশী নয়! ক্রোশের মধ্যেই হবে। সূর্য ওদিকে অস্ত যাচ্ছে।

রাত্রি যখন প্রভাত হল, থিরুমল দেখল তার নৌবহরের চারিদিকে চারখানা যুদ্ধ-জাহাজ। সিংহলী পতাকা উড়িয়ে তারা ঘনিয়ে আসছে ক্রমশঃ। তীরধনুক বাগিয়ে সিংহলী সৈনিকেরা সারিবন্দী দাঁড়িয়ে আছে সেই চারখানা জাহাজের মাথায় মাথায় পাটাতনে পাটাতনে।

এ কী ক্ষ্যাপামি? জেলেডিঙ্গির বহরকে পাকড়াবার জন্য যুদ্ধজাহাজ? কস্মিন-কালে এমন আচরণ কোন সভ্যদেশ করেনি! আর সিংহল ত চিরদিনই সুসভ্য, ভারতীয় ভব্যতারই চিরদিনের অংশীদার! তবে এ কী? এই হাস্যকর ব্যাপার?

হাস্যকর এই ব্যাপারখানার মূলে আছেন জ্যোতিষী জন্তক। কে না জানে যে সিংহলে জ্যোতিষীদের প্রতিপত্তি চিরদিনই প্রবল? রাজাকেও ওদের শাসন মেনে চলতে হয় অনেক সময়। জন্তক, সবে এই ছয় মাস আগে গুণে বলেছেন যে জলপথ বেয়ে সমূহ সংকট ঘনিয়ে আসছে সিংহলকে গ্রাস করবার জন্য। সেই ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হওয়ার পরই রণপোত ঘুরছে সিংহলের উপকূলে উপকূলে, প্রত্যাশিত সেই সংকটকে আগু বাড়িয়ে রুখবার জন্য।

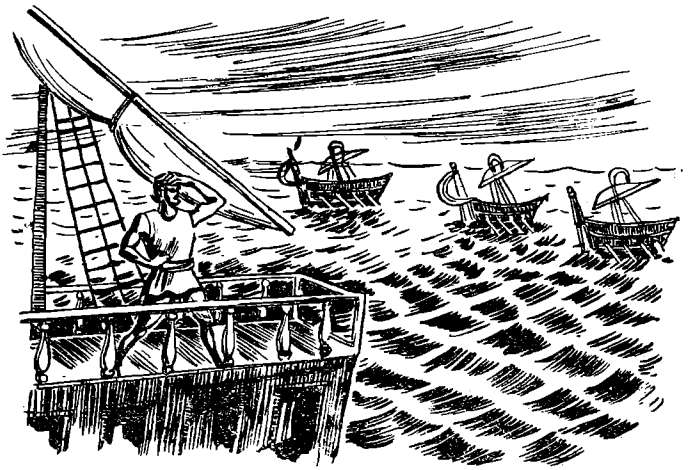

থিরুমল দেখল নৌবহরের চারিদিকে যুদ্ধ জাহাজ। [পৃষ্ঠা ৪১০

থিরুমল চোঙ মুখে দিয়ে চেঁচিয়ে বলছে—"আমরা চোল রাজ্যের মানুষ, মাছ ধরছিলাম একশো ক্রোশ উত্তরে। ঝড়ে আমাদের ঠেলে এনেছে। ঝড় যখন থেমেছে, আমরা নিজের দরিয়ায় ফিরে যাব এক্ষুণি। আমাদের ঘিরেছ কেন?"

কেন ঘেরা হয়েছে, সে-কারণ ঠিক জানে না জাহাজের অধ্যক্ষেরা। তারা হুকুম তামিল করতে বাধ্য। হুকুম আছে তাদের উপর—বাইরের কোন জলযান সিংহলের জলে দেখলেই তাকে ধরে তার আরোহীকে হাজির করতে হবে রাজার কাছে।

তা এ জল যে সিংহলের, সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন ত ওঠেই না। অতএব থিরুমল গর্গকে বেঁধে নিয়ে একজন পোতাধ্যক্ষ রাজধানীতে চললেন বীরদর্পে। চারখানা জাহাজ পূর্ববৎ বেষ্টন করেই রইল চোল জেলেদের ডিঙ্গির বহরকে।

রাজা মেঘবর্ণ। তিনদিন পরে অনুরাধাপুর রাজধানীতে বসে হুকুম দিলেন—"তদন্ত হোক। চোল যুবরাজ ইল্বল আমার সহপাঠী বন্ধু। তাঁর কাছ থেকে সঠিক খবর অবশ্যই পাওয়া যাবে। তিনি যদি এদের ছেড়ে দিতে বলেন, অবশ্যই দেওয়া হবে। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে খবর যতদিন না পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন জেলেগুলোকে এনে খাটিয়ে নাও। মাছধরার কাজে নয়, এদের লাগিয়ে দেওয়া হোক, মুক্তাতোলার খাটুনিতে। বসিয়ে বসিয়ে এত লোককে খাওয়াবে কি?"

থিরুমল গর্গকে কিন্তু মুক্তাতোলার কাজে লাগানো হবে না। লোকটা ত আকারে প্রকারে দৈত্যবিশেষ। ওকে কড়া পাহারাতে রাখা হোক কারাগারেই। কাজ? তা

কাজ ওকে দেওয়া যায় নারকেলের দড়ি পাকানোর। সিংহল নারকেলেরই দেশ। নারকেলের আঁশ বার করে তাই পাকিয়ে দড়ি বানানো—এ একটা বড় ব্যবসা ওখানে।

মেঘবর্ণ হুকুম দেবার পরেই ভুলে গেলেন তুচ্ছ ব্যাপারটা। চোলদেশে চিঠি লেখা? সেজন্য সচিবেরা রয়েছে। মুক্তা তোলা বা দড়ি পাকানোর তত্ত্বাবধানেও রয়েছে সব উপযুক্ত লোক। মেঘবর্ণ হাতী শিকারের জন্য চলে গেলেন নিকুম্ভ জঙ্গলে। এককালে নাকি কুম্ভকর্ণের খোরাকির জন্য হাতী পোষা হত ঐখানে। এখন সেইসব হাতীর বংশধরেরাই হয়ে গিয়েছে কুনো।

দীর্ঘ ছয় মাস কেটে গেল, অনুরাধাপুর থেকে চিঠি যেতে এবং তার উত্তর আসতে। উত্তর যখন এল, মেঘবর্ণ হেসেই কুটিকুটি—"ইল্বল বন্ধু আমার, সেই ছেলেবেলার মতই ছেলেমানুষ রয়ে গিয়েছে দেখছি। তুচ্ছ জেলে কয়েক শো, তাদের দুঃখে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছে। দাও হে দাও। চোল জেলেগুলোকে পাঠিয়ে দাও নিজের দেশে। ওদের নৌকোগুলো আছে ত?"

নৌকো? তা আছে হয়ত। তবে খুঁজে দেখতে হবে। সব এক জায়গায় নেই। সিংহল সরকারের দরকার মত দুই চারখানাকে এদিকে ওদিকে পাঠানো হয়েছে। ভাল অবস্থাতেও নেই হয়ত। কে আর যত্ন নিতে গিয়েছে ওসব বিদেশী ডিঙ্গির? এদেশের মাছধরার নৌকো অন্যরকম। চোল ডিঙ্গি নিয়ে মাছ ধরতে রাজী হবে না কোন সিংহলী ধীবর। কে অকারণ আলকাতরা আর গাব মাখাবে ওদের গায়ে?

তা নৌকো চুলোয় যাক, মানুষগুলো আছে ত ঠিক?

তাও হঠাৎ বলা যায় না। খুঁজে দেখতে হবে। মুক্তো তোলা এক ঠাঁইয়ে হয় না। দেশটা দ্বীপ, মুক্তোর দহ চার উপকূলে ছড়ানো। কে কোথায় আছে, ঠিক কী! তার উপরে, বেঁচেই যে আছে সবাই, তারই বা নিশ্চয়তা কী? হাঙ্গরে ত আকছার কাটছে ডুবুরীদের।

খুঁজে পেতে নৌকো পাওয়া গেল পাঁচশোর ভিতরে সাড়ে তিনশোর মত। তার ভিতর তিনশোই কাজের বার হয়ে গিয়েছে। সমুদ্রে ভাসানোই যাবে না তাদের। আর মানুষ? দেড় হাজার ধীবরের মধ্যে পঞ্চাশটার মত লোক নিখোঁজ। আর নিখোঁজ খোদ-থিরুমল গর্গ। অসুরের মত সেই পালোয়ান মানুষটা, যে ছিল ডিঙ্গির বহরের মোড়ল মাঝি।

অবশ্য থিরুমলকে নিখোঁজ পর্যায়ে ফেলাটা ঠিক হবে না। কীভাবে সে মারা গেল, তা জানা আছে অনেকের। নারকেল দড়ি পাকানোতে সে কোনদিন অভ্যস্ত ছিল না। হাল ধরে ধরে হাত তার যতই শক্ত হয়ে থাকুক, তাঁশ বার করতে গিয়েই সে হাত ফালা ফালা হয়ে চিরে গেল। সে হাত নিয়ে সে ওকাজ আর করবে কেমন করে? তত্ত্বাবধায়ককে সে

বলল—"আমায় অন্য কাজ দিন।" তিনি তা কেমন করে করবেন? রাজার আদেশ ওকে দড়ি পাকাতে হবে। গোঁয়ার থিরুমল সে আদেশ মানতে অস্বীকার করল। ফলে তাকে বন্ধ করা হল অন্ধকূপে, খাওয়া বন্ধ করা হল তিনদিনের জন্য। আর সেই তিনদিনের ভিতরই বদলি হয়ে গেলেন কারাধ্যক্ষ। নতুন লোক দিন দশেকের ভিতর জানতেই পারলেন না যে অন্ধকূপে পড়ে আছে একটা ভারতীয় কয়েদী। তখন গিয়ে দেখা গেল লোকটা মারা গিয়েছে।

অতএব একান্নজনকে বাদ দিয়ে বন্দী ধীবরদের চোল দেশে পাঠানো হল সিংহলী নৌকায়। ভারতীয় নৌকা কোন মাঝি জলে নামাতে রাজী হয়নি।

নৌকার কথা থাকুক। একান্নজন ভারতীয় গেল কোথায়? চোল রাজের কাছ থেকে প্রশ্ন এল সিংহলে। "তারা মারা গিয়েছে নানা ব্যাধিতে—" গেল সিংহলরাজের উত্তর—"মানুষ ত অমর নয়। সুতরাং একান্নটা মানুষ যদি মরে থাকেই, তা নিয়ে হইচই করার কী আছে?"

না, হইচই করার কিছু থাকত না, যদি মৃত্যুটা তাদের স্বাভাবিক হত। চোল ধীবর যারা বেঁচে ফিরেছে, তারা যে এক বাক্যে বলছে যে মৃত্যুটা হয়নি স্বাভাবিক। হাঙ্গরে মেরেছে তাদের। আর দলনায়ক থিরুমলের খবর ত কারও কাছ থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না, তাকে আগাগোড়াই আলাদা রাখা হয়েছিল! তাঁর মৃত্যুটা রহস্যেই আবৃত রয়ে গিয়েছে।

এই নিয়েই চিঠি চালাচালি! কলহের সূত্রপাত! যুদ্ধ ঘোষণা। একান্নটা মানুষের জীবন ছেলেখেলা নয়। কোন অন্যায় তারা করেনি। ভারতীয় এলাকার সমুদ্রে মাছ ধরতে ধরতে তাদের নৌকো ঝড়ের তাড়নায় গিয়ে পড়েছিল সিংহলের এলাকায়। তাদের বন্দী করে মেরে ফেলা বর্বরোচিত আচরণ, এবং ক্ষতিপূরণ করতে হবে সিংহলকে, না করলে যুদ্ধ।

অতএব সাজো সাজো রব চোল দেশে। যুবরাজ ইল্বল সৈন্যসজ্জা করে বেরিয়ে পড়লেন সমুদ্রপথে। দিগ্বিজয়ের নেশায় নয়, ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য। মেঘবর্ণ দম্ভভরে লিখে পাঠিয়েছিলেন—"সামান্য ধীবর, তাদের মৃত্যু নিয়ে অত ঝামেলা বাধানো কি অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি নয়?"

ইল্বল উত্তর দিয়েছিলেন—"বিদায়কালে আমার গুরু আমায় বলে দিয়েছিলেন—কেউ কারও চেয়ে ছোট নয় পৃথিবীতে। তোমার মনে থাকতে না পারে, কিন্তু সেই গুরু তোমারও গুরু ছিলেন একদা।"

যুদ্ধ হল দীর্ঘকাল ধরে। মেঘবর্ণ পিছু হঠতে হঠতে নিকুম্ভ জঙ্গলে গিয়ে আত্মগোপন করলেন।

চোল সৈন্য হানা দিল সেখানেও। বন্দী হলেন মেঘবর্ণ।

ইল্বল এদিকে থিরুমলের ইতিহাস সবই জেনে ফেলেছেন। সিংহলী কারাবিভাগের কর্মচারীরাই প্রকাশ করেছে সব কথা। ইল্বলকে দেখিয়েছে সেই অন্ধকূপ, যেখানে আবদ্ধ রাখা হয়েছিল থিরুমলকে। যেখানে অনাহারে তিলে তিলে জ্বলে পুড়ে অবশেষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল অভাগা ধীবর।

ইল্বলের আদেশে সেই অন্ধকূপেই নিক্ষিপ্ত হলেন মেঘবর্ণ।

ইল্বলকে ধিক্কার দিয়ে মেঘবর্ণ বলে পাঠালেন কারারক্ষী মারফত—"রাজার প্রতি এই কী যোগ্য আচরণ রাজার ?"

"রাজা বলে স্বতন্ত্র কোন জীব সৃষ্টি করেননি ভগবান"—বলে পাঠালেন ইল্বল—"তিনি সৃষ্টি করেছিলেন মানুষ। সব মানুষই তাঁর চোখে সমান। ধীবর মাছ ধরে সমাজের সেবার জন্য, রাজাও দেশ শাসন করেন সমাজের সেবার জন্য। সেবার মূল্য দু'জনেরই সমান। কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়। মানুষ থিরুমল যে আচরণ লাভ করেছে তোমার কাছে, মানুষ মেঘবর্ণও সেই আচরণই প্রত্যাশা করতে পারে আমার কাছে। তার চেয়ে ভালও কিছু নয়, মন্দও কিছু নয়।"

দিনের পর দিন কাটে। অনাহারে মেঘবর্ণকে থাকতে হয় না। নিত্য নিয়মিত খাদ্য তাঁকে দিয়ে যায় কারারক্ষী। কিন্তু এ ত মেঘবর্ণের অভ্যস্ত সে রাজভোগ নয়। মোটা দুর্গন্ধ তণ্ডুলের ভাত আর কুচো চিংড়ির ঝোল। প্রথম দুই দিন বমি করে ফেললেন মেঘবর্ণ, তা খেতে গিয়ে। ক্রমে কিন্তু তা অভ্যাস হয়ে এল। ক্ষুধার মুখে সেই চিংড়ির ঝোলই লাগে অমৃতের মত।

পর্ণশয্যায় শয়ন রাজার। স্যাঁৎসেতে মেঝেতে খড়ের গাদা। তারই উপরে পড়ে থাকেন মেঘবর্ণ। প্রথম প্রথম সে শয্যাকে মনে হত কণ্টকশয্যা। কিন্তু দুই দিনে তাও এক-রকম সহ্য হয়ে এল। এক একদিন টেরই পান না যে রাত কোন্ দিক দিয়ে কেটে যায়। প্রভাতে নিজেই অবাক্ হয়ে যান যে সে গাঢ় নিদ্রার কথা স্মরণ করে। অবাক্ হবারই ত কথা! কারণ আগে ত তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি কোনদিন যে একটা রাজা এরকম ঘরে এরকম বিছানায় এক দণ্ডও ঘুমোতে পারে!

একদিন ভোর রাতে ঐরকমই গাঢ় নিদ্রা থেকে হঠাৎ জেগে উঠলেন মেঘবর্ণ। ঘুমের ঘোরেই তাঁর যেন কেবল মনে হচ্ছিল—অন্ধকূপে তিনি একা নন, আরও কে যেন আছে ঘরের ভিতর। এক একবার নিঃশব্দে পায়চারি করছে যেন।

সে কী? গুপ্তঘাতক নয় ত? অসম্ভব কী? শত্রু রাজাকে বন্দী করে রেখে

বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন মেঘবর্ণ।

শুতি রাতে তাঁকে মেরে ফেলা—এ রাজাদের কূটনীতিরই অঙ্গবিশেষ! ইল্বলও কি সেই মতলবই করেছে?

"কেন করবে না? সব মানুষই সমান!"

মনের উত্তেজনায় কথাটা জোরে জোরেই উচ্চারিত হল মেঘবর্ণের মুখ থেকে। আর উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই বিছানা থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে তিনি দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। আততায়ী যদি এসেই থাকে, আত্মরক্ষার একটা চেষ্টা করবেনই মেঘবর্ণ। ভেড়ার মত মাথা পেতে দেবেন না কশাইয়ের ছুরির নীচে। অস্ত্র না থাকুক, বাহুবল ত আছে! চাল মোটা হোক, চিংড়ি কুচো হোক, দেহটাকে তারা সবল রেখেছে এখনও।

কিন্তু আততায়ী যে কথা কইছে! এটা ত অভাবনীয়! হত্যা করতে এসে ঘাতক কি কথা বলে কখনো?

এ লোক কিন্তু কথা কইছে। জবাবই দিচ্ছে মেঘবর্ণের কথার। নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল—"সব মানুষই সমান।" সেই কথারই খেই ধরে আততায়ী বলছে —"মেঘবর্ণ! গুরুও তাই বলেছেন, সব মানুষই সমান। মন্দর দিক দিয়েও সমান, ভালোর দিক দিয়েও তাই। ধীবরের জীবনের দামও যা, তোমার জীবনের দামও তাই। ধীবর অপঘাতে মরতে পেরেছে, রাজাই বা পারবে না কেন?"

"কে? কে তুমি?"—বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন মেঘবর্ণ।

"আমি ইল্বল। তোমার এককালের সহপাঠী। তোমার চিরদিনের বন্ধু"—উত্তর দিল, মেঘবর্ণকে হতবাক করে দিয়ে।

"তুমি? তুমি এখানে কেন?" অবশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কোন রকমে।

"আমি এখানে কেন? তোমাকে অন্ধকূপে ফেলে রেখে আমি রাজশয্যায় নিশিযাপন করতে পারি? তুমি আমি কি সমান নই! দেখবে এস! বাল্যে কৈশোরে পাশাপাশি

যেমন নিশিযাপন করতাম গুরুগৃহে, আজও তেমনি করছি। দিন গুণছি—কবে তোমার চিত্ত অহমিকার পাপ থেকে মুক্তি পাবে।"

ইল্বলের ইঙ্গিতে রক্ষী আলো নিয়ে এল। আর মেঘবর্ণের হাত ধরে ইল্বল বেরিয়ে এলেন অন্ধকূপ থেকে। পাশেই আর একটা অন্ধকূপ। তাইতে প্রবেশ করে একটা পর্ণ-শয্যা মেঘবর্ণকে দেখালেন ইল্বল—"ঐখানে আমি শুই। যেদিন থেকে তোমায় নিক্ষেপ করেছি অন্ধকূপে, সেইদিন থেকেই। না শুয়ে পারব কেন? তুমি আমি যে সমান! তোমায় দণ্ড দিতে গিয়ে নিজেও যে কষ্ট পাচ্ছি, তারই প্রমাণ এই পর্ণশয্যা।"

মেঘবর্ণ কেঁদে ফেললেন। তার পরে ইল্বলের হাত ধরে বললেন—"প্রকৃত রাজা তুমিই। তুমি ধর্মরাজ। গুরুদেবের শিক্ষা তোমাতেই সার্থক হয়েছে।"

মজার ছবি

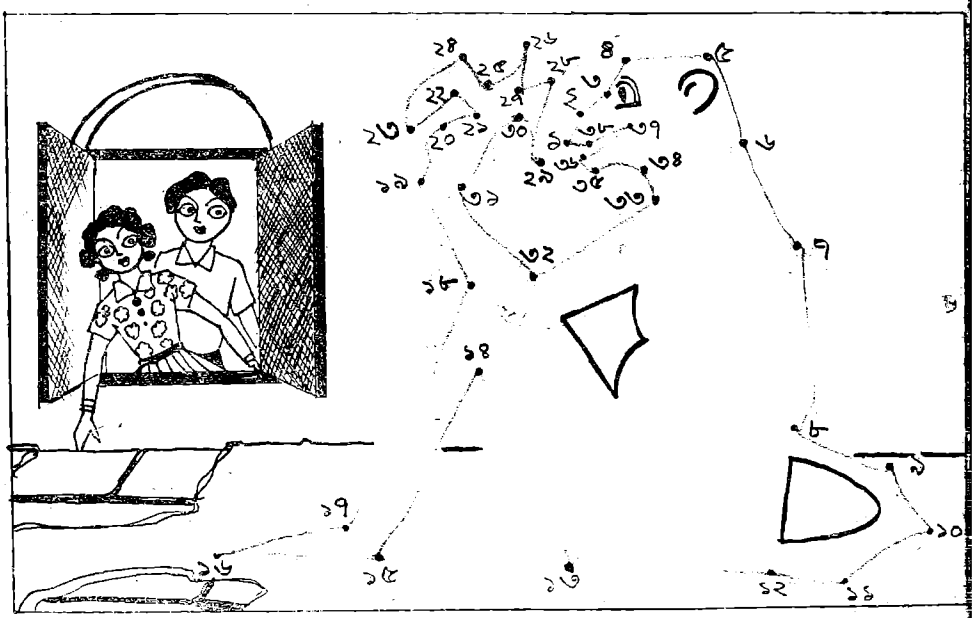

বলো ত ভাই বোনে অবাক হয়ে কি দেখছে, না পারলে ১ থেকে ৩৮ অবধি দাগ দাও

ঘোঁতনদার বিয়েতে

জীবন ভৌমিক

গেল বছর পুজোর সময় আমাদের ক্লাবে 'হেতমপুরের সিংহাসন' বইয়ে ঘাতকের ভূমিকায় প্রাণঘাতী অভিনয় করার পর অনেকদিন ঘোঁতনদার দেখা নেই। একদিন আমরা সবাই দুন্দুভি লেনে ঘোঁতনদার বাড়িতে গিয়ে জানতে পারলাম যে ঘোঁতনদা হৃদয়পুরে তার জেঠামশাইয়ের বাড়িতে চলে গেছে। ঐখানেই থাকে। ঘোঁতনদার হৃদয় পরিবর্তন করার জন্যেই বোধহয় জেঠামশাই ঘোঁতনদাকে হৃদয়পুরে নিয়ে গেছে। ঘোঁতনদার জেঠামশাই শুনেছি খুব হৃদয়বান লোক।

ঘোঁতনদার মুখখানি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

ঐ হৃদয়পুর থেকেই চিঠিখানা এসেছে। ঘোঁতনদার বিয়ের চিঠি। নকশা করা ছাপানো কার্ড, প্রজাপতি আঁকা। প্রজাপতির শুঁড় দুটো দেখে ঘোঁতনদার মুখখানা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। বাতাবি লেবুর মত মুখখানা, পুরু ঠোঁটের ওপর প্রজাপতির শুঁড়ের মত সরু দুখানা গোঁফ নাকের ওপর দিকে উঠে গেছে। ঐ গোঁফখানা ঘোঁতনদার স্পেশাল। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ঐ গোঁফ ট্রেডমার্ক করিয়ে নিয়েছে। মানে অন্য কেউ ঐ ধরনের গোঁফ রাখতে পারবে না। রাখলে ঘোঁতনদা তার নামে আদালতে কেস ঠুকে দিতে পারবে।

তা, যাই হোক। চিঠি পড়ে জানা গেল আসছে বাইশে ঘোঁতনদার বৌভাত। চিঠির একেবারে শেষে লেখা আছে—'আশীর্বাদের পরিবর্তে লৌকিকতা প্রার্থনীয়।' চিঠিখানার শেষে নাম লেখা আছে ঘোঁতনদার জেঠার। জেঠামশাইয়ের মত হৃদয়বান লোক যে এমন কথা কী করে লিখলেন আমি ভেবে পেলাম না। চিঠির একধারে কালি দিয়ে ঘোঁতনদা লিখে দিয়েছে—'তাড়াহুড়ো করে জেঠামশাই আমার বিয়ে দিয়ে

দিল, তাই তোদের বরযাত্রীর নেমন্তন্ন করতে পারলাম না। বৌভাতে তোদের সকলকেই আসতে হবে কিন্তু।'

ঘোঁতনদার কথা অমান্য করবার সাধ থাকলেও সাধ্য নেই। সকালবেলায় প্যালার বাড়িতে গেলাম। প্যালাকে সঙ্গে নিয়ে বিলের বাড়িতে। পিকলুকে আর টোগড়েকে ডেকে নিয়ে আমরা ওদের বাগানের গাবতলায় বসলাম। সকলের হাতেই ঐ শমন। মানে ঘোঁতনদার বিয়ের চিঠি। আমরা সবাই অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। কারও মুখে কোনও কথা নেই। খুব বিপদে পড়লে লোকের যেমন হয় আমাদের অবস্থা সেই রকম। টোগড়ে এই সময় বিশুদ্ধ বাঙাল ভাষায় বলল—বোন্দা মাইরা বইস্যা থাকলেই চলব নাকি রে? ঠিক কইরা ফালা ঘোঁতনদার বিয়াতে দিবি কী?

পাঁচজনে পাঁচ টাকা করে মোট পঁচিশ টাকা চাঁদা ধরা হল। পঁচিশ টাকার মধ্যে একটা বেশ ভাল জিনিস নির্বাচন করা চাই। ভাল হলেই হবে না, জিনিসটা কাজের হওয়া চাই। সবাই মিলে উপহার দেওয়ার এই এক ফ্যাসাদ। ফ্যাসাদ বললে আর কি হবে। যা হোক ব্যবস্থা তো করতেই হবে। ঘোতনদাকে সন্তুষ্ট না রাখলে আমাদের চলবে না।

তিন ঘণ্টা গাবতলায় বসে মিটিং করেও আমরা ঠিক করতে পারলাম না, ঘোতনদার বিয়েতে আমরা কী দেব। নানারকম উপহারের কথা উঠল। কিন্তু আমাদের পাঁচ-জনের মনের মত কোনও জিনিস হয় না। আর হলেও পঁচিশ টাকায় তা পাওয়া যাবে না। বিলে বলেছিল ইলেকট্রিক হিটার দেবার কথা। এই একটা জিনিসে আমাদের সকলে একমত ছিলাম। কিন্তু হলে হবে কি! হৃদয়পুর পাড়া-গাঁ। ইলেকট্রিক নেই। হিটার দিয়ে করবে কি?

পরের দিন বৌভাত। বিকেলের ট্রেনে আমাদের হৃদয়পুর যেতে হবে। সকাল-বেলাতেও কিছু ঠিক হল না। পঁচিশটা টাকা আমার কাছে জমা রয়েছে। দুপুরের পর বিলে, প্যালা, পিকলু ও টোগড়ে আমার কাছে চলে এল একেবারে ধোপদুরস্ত হয়ে। প্যালা বললে—এক ঘণ্টার মধ্যে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। তারপর বেরিয়ে পড়ে উপহার কিনে সোজা স্টেশনে চলে যাব। চারটে দশের গাড়ি ধরতে না পারলে মুশকিলে পড়তে হবে। এক ঘণ্টা কেন দু ঘণ্টাতেও আমরা কিছু ঠিক করতে পারলাম না। উপহারের জিনিস ঠিক করা নিয়ে টোগড়ের সঙ্গে পিকলুর প্রথমে তর্কাতর্কি ও পরে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে গেল। এদিকে ট্রেনের সময় হয়ে গেল। ঠিক হল ঐ পঁচিশটা টাকাই দিয়ে দেব। বিয়ের চিঠিতে 'আশীর্বাদের পরি-বর্তে লৌকিকতা প্রার্থনীয়' যে লিখতে পারে সে চশমখোর। টাকা পেলেই খুশী হবে।

—কি বাবা! বন্ধুর বৌ কেমন হয়েছে? [পৃষ্ঠা ৪২০

আমরা যখন স্টেশনে পৌঁছেছি তখন গাড়ি প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। টিকিট কাটতে গেলে আর ঐ গাড়ি ধরা যাবে না। বিলে বলল—ধুত্তোর ছাই, টিকিট কাটতে হবে না, চলে আয়।

হৃদয়পুর স্টেশনে নেমেই টোগড়ে বলল—খাইসে। জিজ্ঞেস করলাম—কী হল রে? টোগড়েকে কিছু বলতে হল না। বুঝলাম গেটের সামনে কালো কোট পরা টিকিট চেকারকে দেখেই টোগড়ের মুখ দিয়ে ঐ শব্দটা বেরিয়ে পড়েছে।

টোগড়ে আমাদের চারজনকে ঠেলতে ঠেলতে একটা ওজন নেবার যন্ত্রের কাছে নিয়ে গেল। এবং একে একে সবাইকে ওজন যন্ত্রে চাপিয়ে একটা করে দশ পয়সা দিয়ে ওজন নিল। নিজেরটাও নিল। তারপর পাঁচটা ওজনের টিকিট নিয়ে আমাদের বলল—চল, আউগ্যা। গেট দিয়ে আমরা একে একে বেরিয়ে যাবার পর টোগড়ে টিকিট চেকারের হাতে ঐ পাঁচটা ওজনের টিকিট গুঁজে দিয়েই ভোঁ দৌড়।

একরকম দৌড়তে দৌড়তেই আমরা বিয়ে বাড়ি পৌঁছে গেলাম। আমাদের দেখে ঘোঁতনদার সে কি আনন্দ। বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে ঘোঁতনদা তার জেঠার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। আমরা সকলে লাইন দিয়ে জেঠামশাইকে প্রণাম করলাম। জেঠামশাই বলল—তোমাদের কথা ঘোঁতনার মুখে কত শুনেছি। তোমরা ওর বন্ধু—বিয়েতে ভাল উপহার দিচ্ছ তো!

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আমরা একসঙ্গে বলে উঠলাম।

পিকলু বলল—আমরা নগদ পঁচিশ টাকা দেব। কেন না—

পিকলুকে আর কিছু বলতে না দিয়ে ঘোঁতনদার জেঠা বললে—বাঃ বাঃ খুব ভাল। যত বাজে জিনিস না দিয়ে টাকা দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। যাও তোমরা একটু

গল্পটল্প কর। তারপর ঘোঁতনার সঙ্গে গিয়ে বৌমাকে দেখে খেতে বসে যাও—আবার কলকাতায় ফিরতে হবে।

পাত খালি ছিল। খেতে বসে গেলাম। খেয়েদেয়ে একেবারে বৌ দেখে টাকাটা দিয়ে কেটে পড়ব। ছাদে যেখানে খাওয়া দাওয়া হচ্ছে, সেখানে একটা ব্ল্যাকবোর্ডএ খড়ি দিয়ে কী কী খাবার আছে তার একটা তালিকা লেখা আছে। লুচি, বেগুন-ভাজা, ছ্যাঁচড়া, ডাল, ফিশফ্রাই, ফ্রায়েড রাইস, মাংস, চাটনি, মিহিদানা, দই, রসগোল্লা পরপর সব লেখা আছে। বেগুন ভাজার জায়গা কেটে দিয়ে লেখা আছে 'শেষ'। খেতে বসে দেখলাম বেগুন ভাজা সত্যি নেই। লুচির সঙ্গে ছ্যাঁচড়া দেওয়া আছে। তারপর ডাল এল। এই সময় টোগড়ে কানে কানে বলল—ন্যাড়া, ফিশফ্রাই কাইট্যা দিল। বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখি শুধু ফিশফ্রাই নয়, ঘোঁতনদার জেঠা বোর্ড থেকে 'মাংস' কেটে 'শেষ' লিখে দিয়ে চলে গেল। আমরা বোর্ডের দিকে যখন তাকিয়েছিলাম সেই ফাঁকে যে ডাল দিচ্ছিল সে ডাল না দিয়েই ভেগে পড়েছে। চামড়ার মত লুচি, ছ্যাঁচড়া দিয়ে চিবিয়ে চোয়াল ব্যথা হয়ে গেছে। প্যালা টোগড়েকে বলল—ফ্রাইড রাইস নিয়ে এলে বালতিসুদ্ধু এখানে বসিয়ে রাখবি। বলতে না বলতেই ঘোঁতনদার জেঠা ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে এসে দাঁড়াল এবং চকিতে 'রসগোল্লা' আর 'ফ্রায়েড রাইস' কেটে দিয়ে চলে গেল। বিলের দিকে তাকিয়ে দেখি সে তখনও ফ্যালফ্যাল করে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে আছে আর তার চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়ছে। বেচারার নেমন্তন্ন খাবার খুব শখ। প্যালা একটা বিকট শব্দ করে ঢেঁকুর দিয়ে উঠে পড়ল। আমরাও।

নীচে নামার পথে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ঘোঁতনদার বৌকে একবার দেখে নিলাম। ঘোঁতনদার মতই মোটা। সোজা নেমে চলে যাচ্ছিলাম, ঘোঁতনদাকে না জানিয়েই। ঘোঁতনদার জেঠা ধরল—কি বাবা! বন্ধুর বৌ কেমন হয়েছে?

বুকপকেটের পঁচিশটা টাকা চেপে ধরে টোগড়ে বলল—মোটামুটি মানিয়েছে ভাল। বলেই আমাদের সকলকে ঠেলে নিয়ে বেরিয়ে এল।

রাস্তায় একটা ভাল খাবারের দোকানে বসে পাঁচজনে ঐ পঁচিশ টাকার দই-সন্দেশ-রসগোল্লা খেয়ে কলকাতার গাড়ি ধরলাম।

———

অনিল ভৌমিক

৪

ভোর হয়, সূর্য উঠতে আর দেরি নেই।

আবছা আলোয় ফ্র্যান্সিস দেখল—চারপাঁচজন ঘোড়সওয়ার দস্যু কাকে যেন দড়িতে হাত বেঁধে বালির ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে। লোকটা হাতে বাঁধা দড়িটা টানছে। কাকুতি মিনতি করছে। ফ্র্যান্সিস সেই আবছা আলোতেও চিনল—লোকটা আর কেউ না—ফজল। কিন্তু ফজলকে ওরা কোথায় নিয়ে চলেছে? হঠাৎ ঘোড়াগুলো ছুটতে শুরু করল। ফজল বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল। পৈশাচিক আনন্দে ওরা ফজলকে বালির ওপর দিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে চলল।

ফ্র্যান্সিস বুঝতে পারল—ফজল ওকে সাহায্য করেছে—প্রাণে বাঁচিয়েছে। সেই অপরাধের শাস্তিটা ওকে পেতে হচ্ছে। ও আর দাঁড়াল না। যে করেই হোক ফজলকে বাঁচাতে হবে। তাঁবুতে ফিরে এসে পোশাক পরে নিল। কোমরে তরোয়ালের বেলট বাঁধল। তারপর নিঃসাড়ে খেজুর গাছে বাঁধা ঘোড়াটাকে খুলে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল। নিজে চলল ঘোড়াটার আড়ালে আড়ালে। জলাশয়ের ওপাশ দিয়ে কিছুটা এগোতেই একটা উঁচু বালিয়াড়ির পেছনে মরূদ্যানটা আড়াল পড়ে গেল এবার ঘোড়ার পিঠে উঠে ঘোড়া ছোটাল। বালি উড়িয়ে ঘোড়া ছুটল।

সূর্য উঠল। সকালের রোদে তেজ কম। তাই ফ্র্যান্সিসের পরিশ্রমও হচ্ছিল কম। বেশী দূর যেতে হল না। ফ্র্যান্সিস দেখল—একটা নিঃসঙ্গী খেজুর গাছে ফজলের হাতবাঁধা

দড়িটার একটা কোনা বাঁধা রয়েছে। আর ফজলকে ওরা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ফজলের হাত বাঁধা। পা ছুড়ে নানাভাবে ও বাধা দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ওদের সঙ্গে পারবে কেন? ফ্র্যান্সিস ঘোড়া ছুটিয়ে সেই দস্যুগুলোর কাছাকাছি আসতেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ও শিউরে উঠল। কী সাংঘাতিক! ফজলকে ওরা চোরাবালিতে ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে। চোরাবালিতে আটকে গেলেই গাছের সঙ্গে বাঁধা ফজলের হাতের দড়িটা কেটে দেবে। ফ্র্যান্সিসের অনুমানই সত্যি হল। ফজলের একটা মর্মান্তিক চিৎকার ওর কানে এল। দেখল—ফজলকে ওরা চোরাবালিতে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। ফজল প্রাণপণ শক্তিতে গাছের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা টেনে ধরে চোরাবালি থেকে উঠে আসার চেষ্টা করছে। এমন সময় একজন দস্যু মাথার ওপর তরোয়াল তুলল দড়িটা কাটবার জন্যে। এক মুহূর্ত। দড়িটা কেটে গেলেই ফজল চোরাবালির অতল গর্ভে তলিয়ে যাবে। ওর চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ফ্র্যান্সিস উল্কার বেগে ঘোড়া ছোটাল। তারপর চলন্ত ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে সেই দস্যুটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্র্যান্সিস আর দস্যুটা দুজনেই জড়াজড়ি করে বালির ওপর পড়ে গেল। দড়ি আর কাটা হল না। ফ্র্যান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করল না। ছুটে গিয়ে দড়িটা ধরে প্রাণপণে টানতে লাগল। শুধু ডানহাতেই তাকে টানতে হচ্ছিল। কারণ বাঁ কাঁধের ব্যথায় বাঁ হাতটা তখনও প্রায় অবশ হয়ে আছে। দু'তিনটে হ্যাঁচকা টান মারতেই ফজল চোরাবালির গহ্বর থেকে শক্ত বালিতে উঠে এল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। বালিতে শুয়ে পড়ল। এতক্ষণের শারীরিক নির্যাতন, তার ওপর এই মৃত্যুর বিভীষিকা, এই সবকিছু তার দেহমনের শেষ শক্তিটুকু শুষে নিয়েছিল।

এত অল্প সময়ের মধ্যে এত সব কাণ্ড ঘটে গেল। দস্যুর দল কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। ফজলকে চোরাবালি থেকে উঠে আসতে দেখে ওদের টনক নড়ল। ওরা ফ্র্যান্সিসকে ঘিরে ধরল। ফ্র্যান্সিস একবার চারদিক থেকে ঘিরে ধরা দস্যুদের মুখের দিকে তাকাল। তারপর চিৎকার করে বলে উঠল—ফজল আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। যে ওর গায়ে হাত দেবে আমি তাকে দু'টুকরো করে ফেলব।

ফ্র্যান্সিসের সেই ক্রোধোন্মত্ত চেহারা দেখে দস্যুর দল বেশ ঘাবড়ে গেল। এটা যে ফ্র্যান্সিসের শূন্য আস্ফালন নয় সেটা ওরা বুঝল। গত রাত্রে তার প্রমাণও পেয়েছে ওরা। কাজেই ফ্র্যান্সিসকে কেউ ঘাঁটাতে সাহস করল না। নিজেদের মধ্যে ওরা কী যেন বলাবলি করল। তারপর ঘোড়া ছোটাল সেই মরূদ্যানের দিকে। যতক্ষণ ওদের দেখা গেল ফ্র্যান্সিস তাকিয়ে রইল। তারপর দ্রুতপায়ে ফজলের কাছে এল। জলের পাত্রটা খুলে ফজলের চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিল। ফজল দু'একবার চোখ পিটপিট করে ভালোভাবে তাকাল।

মুখ হাঁ করে জল খেতে চাইল। ফ্র্যান্সিস ওর মুখে আস্তে আস্তে জল ঢেলে দিতে লাগল। জল খেয়ে ফজল যেন একটু সুস্থ হল। ফ্র্যান্সিস ওর হাতের দড়িটা কেটে দিল। তারপর ডাকল —ফজল।

ফজল ম্লান হাসল।

—চলো — ঘোড়ায় বসতে পারবে তো ?

ফজল মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ফ্র্যান্সিস ওকে ধরে ধরে কোনরকমে ঠেলেঠুলে ঘোড়ার ওপর বসিয়ে দিল। তারপর নিজে লাফিয়ে উঠে ওর পেছনে বসল। আর সময় নষ্ট না করে ঘোড়া ছোটাল। এ জায়গাটা ছেড়ে পালাতে হবে। বলা যায় না, হয়তো দলে ভারী হয়ে ওরা এখানে আসতে পারে। হলও তাই।

একজন দস্যু তরোয়াল তুলল দড়িটা কাটবার জন্য। [পৃষ্ঠা ৪২২

ফ্র্যান্সিস পেছন ফিরে দেখল—বালির দিগন্ত রেখায় কালো কালো বিন্দুর মত ঘোড়সওয়ার দস্যুর দল ছুটে আসছে।

ফজল এতক্ষণে যেন গায়ে জোর পেল। সে একবার ফ্র্যান্সিসের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল। ক্লান্তস্বরে বলল—

—তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে ভাই।

ফ্র্যান্সিস হাসল—এখনও আমাদের প্রাণের ভয় যায় নি ফজল।

—কেন ?

—পেছনে তাকিয়ে দেখ।

ফজল পেছনে ফিরে তাকাল। ধুলো উড়িয়ে দুরন্ত বেগে ছুটে আসছে মরুদস্যুর দল। একে অসুস্থ ফজলকে ধরে রাখতে হচ্ছে তার ওপর কাঁধের কাটা জায়গাটার যন্ত্রণা—ফ্র্যান্সিস খুব জোরে ঘোড়া ছোটাতে পারছিল না। ক্রমেই মরুদস্যুদের সঙ্গে তাদের ব্যবধান কমে আসছিল।

—ফ্র্যান্সিস? ফজল ডাকল।

—হুঁ।

—সামনে ঐ যে পাহাড়ের মত একটা বালির ঢিবি দেখছো?

—হ্যাঁ।

—ঐ ঢিবিটার ওপাশেই একটা মরূদ্যান আছে।

—ওখানেই যাবে?

—না···না। ঐ ঢিবিটার আড়ালে আড়ালে আমরা ডানদিকে বাঁক নেব।

—কিন্তু—

—এ ছাড়া বাঁচবার কোন পথ নেই। ওরা ধরেই নেবে আমরা নিশ্চয়ই ঐ মরূদ্যানে আশ্রয় নেব, কারণ আমরা দুজনেই অসুস্থ—বেশী দূর যেতে চাইবো না।

—তা ঠিক।

—কাজেই আমাদের আশ্রয়ের জন্যে অন্য কোথাও যেতে হবে।

—কোথায় যাবে সেটা বল।

—ডানদিকে মাইল কয়েক গেলেই আমদাদ শহর। একবার ঐ শহরে ঢুকতে পারলে তোমার আর ভয় নেই।

—কেন?

—ওরা অনেকেই দাগী দস্যু—সুলতানের সৈন্যরা দেখলেই চিনে ফেলবে এইজন্যে ওরা আমদাদ শহরে ঢুকবে না।

—কিন্তু তুমি?

—আমি আর কোথাও আস্তানা খুঁজে নেব।

কথা বলতে বলতে ওরা পাহাড়ের মত উঁচু বালির ঢিবিটার কাছে এসে পড়ল। তারপর ফজলের নির্দেশমত ফ্র্যান্সিস ঢিবিটার আড়াল দিয়ে দিয়ে ঘোড়া ছোটাল। অনেক-দূর পর্যন্ত ঢিবিটার আড়াল পেল ওরা। একসময় ঢিবিটা শেষ হয়ে গেল। সামনে অনেক-দূরে দেখা গেল হলদে সাদা রঙের লম্বা প্রাচীর। ফজল বলল—এই হচ্ছে আমদাদ শহর। আর ভয় নেই। ফ্র্যান্সিস পেছনে তাকাল। ধুধু বালি। মরুদস্যুদের চিহ্নমাত্র নেই।

আমদাদ শহরের প্রাচীরের কাছে এসে পৌঁছল ওরা। ফ্র্যান্সিস দেখল—শহরের পশ্চিমদিকে তামাটে রঙের পাথরের একটা পাহাড়। ফজল আঙ্গুল দিয়ে পাহাড়টা দেখিয়ে বলল—ঐ পাহাড়ের নীচেই সুলতানের প্রাসাদ। আর পাহাড়টার ওপাশে সমুদ্র।

—সমুদ্র ? ফ্র্যান্সিস অবাক্ হল।

—হ্যাঁ, কেন বলো তো ?

—জাহাজডুবি হয়ে ভাসতে ভাসতে ঐ সমুদ্রের ধারেই এসে ঠেকেছিলাম। যদি সমুদ্রের ধারে ধারে পশ্চিমদিকে যেতাম তাহলে অনেকদিন আগেই এই শহরে এসে পৌঁছতাম।

—তুমি তাহলে উল্টাদিকে গিয়েছিলে—মরুভূমির দিকে।

গম্বুজঅলা শহরের তোরণ। কাছাকাছি আসতেই ব্যস্ত মানুষের আনাগোনা নজরে পড়ল। উটের পিঠে, ঘোড়ায় চড়ে শহরে লোকজন ঢুকছে, বেরোচ্ছে। ফজল বলল—এবার ঘোড়া থামাও—আমি এখান থেকে অন্যদিকে চলে যাব।

ফ্র্যান্সিস ঘোড়া থামাল।

—ফ্র্যান্সিস ? ফজল ডাকল।

—হুঁ।

—তোমার তরোয়ালটা আমাকে দাও। ওপরের জামাটাও খুলে দাও।

—কেন ? ফ্র্যান্সিস একটু অবাক্ হল।

—এই পোশাক আর তরোয়াল নিয়ে শহরে ঢুকলে বিপদে পড়বে। আর ভাই কিছু মনে করো না—তোমার ঘোড়াটা আমি নেব। কোথাও তো আশ্রয় নিতে হবে আমাকে।

—বেশ তো।

—আর একটা কথা।

—বলো।

—শহরের সবচেয়ে বড় মসজিদ, মদিনা মসজিদ। যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে। মদিনা মসজিদের বাঁপাশের গলিতে কয়েকটা বাড়ি ছাড়িয়ে মীর্জা হেকিমের বাড়ি। দেখা করে বলো—ফজল পাঠিয়েছে। বিনা খরচে তোমার জখমের চিকিৎসা হয়ে যাবে।

—সে হবে 'খন কিন্তু তোমার জন্যে।

—আমার জন্যে ভেবো না। হ্যাঁ ভালো কথা, ফজল কোমরবন্ধনীর মধ্যে থেকে একটা ছোট্ট সবুজ রঙের রুমাল বের করল। রুমালের গিঠ খুলে দুটো মোহর বের করল। বলল—জানো ভাই, এই মোহর দুটোর পেছনে ইতিহাস আছে। আমাদের কোন এক

পূর্বপুরুষ বিরাট এক মরুদস্যুদলের সর্দার ছিল। একটা ক্যারাভ্যান লুঠ করতে গিয়ে সে এই মোহরদুটো পেয়েছিল। কিন্তু মজার কথা কী জানো। শুনেছি, যে লোকটার কাছে মোহর দুটো ছিল সে কিন্তু বণিক বা ব্যবসায়ী ছিল না।

—তবে ?

—তার পরনে নাকি ছিল পাদরীর পোশাক।

—পাদরী ? ফ্রান্সিস চমকে উঠল।

—হ্যাঁ—তোমাদের ওদিককার লোকই ছিল সে। দাড়ি গোঁফ—কালো জোব্বা পরনে। গলায় চেন বাঁধা ক্রশ।

—হ্যাঁ ঠিকই বলেছো—পাদরীই ছিল সে।

—কাণ্ড দেখ—ধর্মকর্ম করে বেড়ায়, তার কাছে সোনার মোহর।

—তারপর ?

—তারপর থেকে মোহর দুটো বরাবর আমাদের কাছেই ছিল। সবশেষে আমার হাতে এসে পড়ে। যাকগে—মোহর দুটো তুমিই নাও।

—না, না।

—ফ্র্যান্সিস—তুমি তো ঐ দেশেরই মানুষ। ডাকাতি করে পাওয়া জিনিস তুমি নিলে আমাদের পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

মোহর দুটো হাতে নিয়ে ফ্র্যান্সিস উলটেপালটে দেখল। একদিকে একটা আবছা মাথার ছাপ। অন্যদিকে আঁকাবাঁকা রেখাময় নকশার মত কী যেন খোদাই করা। ফ্র্যান্সিস কোমরবন্ধনী থেকে থলি বের করে মোহর দুটো রেখে দিল।

ঘোড়া থেকে নামল দু'জনে। ফ্র্যান্সিস ওর তরোয়াল আর ওপরের জামা খুলে দিল। ফজল হঠাৎ আবেগকম্পিত হাতে ফ্র্যান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ফ্র্যান্সিসও জড়িয়ে ধরল ফজলকে। ফজল বিড়বিড় করে কী যেন বলতে লাগল। বোধ হয় ফ্র্যান্সিসের কল্যাণ কামনা করল। বিদায় জানিয়ে ফজল ঘোড়ার পিঠে উঠল। তারপর মরুভূমির দিকে ঘোড়া ছোটাল। ফজলের কথা ভেবে ফ্র্যান্সিসের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সে ধীর-পায়ে হাঁটতে হাঁটতে তোরণ পেরিয়ে আমদাদ শহরে ঢুকল। তারপর শহরের মানুষদের ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল। (ক্রমশঃ)

পৃথিবী যখন ধ্বংস হল

[জন উইণ্ডহ্যাম-এর "নো প্লেস লাইক আর্থ" অবলম্বনে]

শ্রীবৈজ্ঞানিক

ফট-ফট-ফট-ফট মোটরবোট চলেছে বার্ট-এর।

খাল এখানে তত চওড়া নয়, জোর মাইল দেড়েক দুই। অবশ্য এটা শাখা মাত্র। মূল খাল—যা মেরু থেকে মেরু পর্যন্ত চলে গিয়েছে মঙ্গল গ্রহটার বুক চিরে। তার প্রসার এক এক জায়গায় ষাট মাইল পর্যন্ত রয়েছে।

শাখা যে কত, তার গোনা-গুনতি নেই। উপনিবেশ থেকে এই চারদিনের রাস্তা অতিক্রম করে আসতে আসতে ডাইনে বাঁয়ে কয়েক শো চোখে পড়েছে বার্ট-এর। তার কোনটাই দেড়-দু' মাইলের কম নয় বিস্তারে। তারাও আবার দেদার উপশাখা ছড়িয়ে দিয়েছে এধারে ওধারে। শাখার শাখা, তস্য শাখা, সবচেয়ে কনিষ্ঠ যারা, তাদের উপর দিয়ে, মঙ্গলের মানুষ না পারুক, বার্ট-এর মত পৃথিবীর মানুষ লাফিয়েই এপার-ওপার করতে পারে অনায়াসে।

ওসব শাখা-প্রশাখাতেও বার্ট যাতায়াত করে থাকে বই কি! খদ্দের আছে ওর সব দিকেই। গ্রহটার একান্ত নিরালা কোণে কোণেও। খালের ধারে ধারে এক একখানা ভাঙ্গা বাড়ি। এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়িতে যেতে হলে মোটর বোটেরও এক বেলার ধাক্কা। গ্রাম বলে কিছু নেই মঙ্গলে, কোনদিনই ছিল না বোধহয়। আছে অবশ্য শহর। অর্থাৎ শহরের ভগ্নাবশেষ। পেল্লায় পেল্লায় শহর যে সেকালের বড় কত্তারা গড়েছিলেন মঙ্গলে, গত দশ বৎসর ধরে প্রত্যেক বারের নিঃসঙ্গ জলযাত্রায় বার্ট তার নতুন নতুন পরিচয় পেয়েছে।

কারা যে ছিলেন ঐ বড় কত্তারা, মঙ্গলের মানুষ কেউ এখন তা বলতে পারে না। তাঁরা সব নিঃশেষ হয়ে গেছেন। তাঁরাই গড়েছিলেন ঐসব শহর, ঐসব নিভৃত পল্লীভবন, তাঁরাই কেটেছিলেন এই সব অগণিত খাল-উপখাল মরুভূমিকে সরস শ্যামল করবার জন্য। তাঁরা আজ আদৌ নেই, তাঁদের বাড়ি আর শহরও ভেঙ্গে পড়ে আছে, কিন্তু অজর অক্ষয় হয়ে এখনও গ্রহ জুড়ে বিরাজ করছে নীল জলের সম্ভার নিয়ে ঐ আশ্চর্য রকমের সোজা রহস্যময় খালের মালা।

নীল জলের দুই কূলে সবুজ ক্ষেত। তাদের বিস্তার খুব বেশী নয়। আধ মাইলের

বেশী নয় কোথাও। ক্ষেতটুকু ফুরুলেই শুরু হল লাল ধুলোয় ঢাকা দিগন্তবিস্তারী প্রান্তর। তাদের মাঝে মাঝে ছোট ছোট রুক্ষ পাহাড়, নীরেট লাল পাথরের স্তূপ এক একটি। এই সর্বগ্রাসী লাল রংয়ের দরুনই প্রাচীন পণ্ডিতেরা "লাল গ্রহ" নামকরণ করেছিলেন মঙ্গলের, আর ওরই অধিষ্ঠাতা দেবতাকে কল্পনা করেছিলেন রণদেবতা বলে।

উপনিবেশ থেকে বেরুবার সময় কোনবারই বার্ট পথের মাঝে কোথাও থামে না, সোজা চলে যায় তার টহল-সীমার শেষ প্রান্ত অবধি, পুরো পাঁচ দিনের পথ মোটর বোটের। এখানে অ্যানিকার খামার, একটা ভাঙ্গা বাড়িকে ঘিরে বারোখানা ক্ষেত, যার মোট আয়তন পৃথিবীর পরিমাণে কুড়ি একরের বেশী হবে না। নদীর অঢেল জল সত্ত্বেও সে-সব ক্ষেতের কোনরকম শস্যেই পৃথিবীর ধান যব গমের সতেজ শ্যামলিমা নেই, কেমন যেন হলুদ-পানা মরাংচে চেহারা তাদের।

হ্যাঁ, উপনিবেশ থেকে বেরিয়ে প্রতিবারই সে সোজা চলে আসে অ্যানিকার খামারে। এখানকার কাজ সেরে ফেরার পথে একে একে দেখা দেয় অন্য খরিদ্দারদের খামারে। পুরো চক্কোরটা সমাধা করে উপনিবেশে ফিরতে মাস তিনেক লাগে তার। ফেরার সময় আর কাজ নেই কিছু বিশেষ। একটা ঝালাইয়ের দোকান ওর আছে বটে কলোনিতে, কিন্তু তাতে আর কয়টা বাসন আসে রোজ? তার মত ঝালাইওয়ালা গণ্ডা গণ্ডা রয়েছে রাস্তায় রাস্তায়, আর সে-সব লোকের উপরে আস্থাও বেশী উপনিবেশীদের। কারণ তারা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর হাজির থাকে দোকানে, বার্ট-এর মত হঠাৎ ডুব দেয় না দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে।

ডুব? না দিয়ে পারে না বার্ট। উপনিবেশের অন্য সবাইয়ের মত দিনের পর দিন শুয়ে বসে জাবর কাটতে সে পারে না। সকালটা দোকানে বসা, বিকালটা পথে পথে আড্ডা দেওয়া, সন্ধ্যাটা ক্লাব ঘরে গিয়ে সস্তা দেশী মদ ঢক ঢক করে গেলা, আর হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীর জন্যে হা-হুতাশ করা, এরকম ভাবে জীবন যাপন করতে পারে না বার্ট।

হারিয়ে গেল পৃথিবীটা। বিধ্বস্ত, বিলুপ্ত হয়ে গেল বার্ট-এর চোখের সামনেই। ও তখন আকাশপথে; মঙ্গলযাত্রী আন্তর্গ্রহ-বিমানে যান্ত্রিকের পদ নিয়ে সেই বারই সে প্রথম বেরিয়েছে মহাশূন্য অভিযানে। বয়স মাত্র একুশ।

যাত্রা শুরুর পর চার দিনের দিন রাত্রিবেলায় ওটা ঘটল। বার্ট-এর তখন কাজের পালা নয়, নিজের দোলনায় সে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ কে তাকে টেনে নামাল। "ওঠ! ওঠ! শীগ্‌গির আয়! ছাখ্ এসে কী সর্বনাশ হচ্ছে।"

কোনরকমে পোশাকটা গায়ে চড়িয়ে আবেগ-এর সঙ্গে সে বেরিয়ে এসেছিল।

হাওয়া চলাচলের জন্য সারি সারি গবাক্ষ বিমানের গায়ে। বন্ধ ছিল সবই। একটা টেনে খুলে ফেলল আবেল, বার্টকে নিয়ে দাঁড়াল সেইখানে।

নীচে ঐ পৃথিবী। কী হচ্ছে ওখানে? আগুন! আগুন! লেহি-লেহি শিখা উঠছে আগুনের, দাউ দাউ জ্বলছে পর্বতপ্রমাণ প্রলয় বহ্নি। পৃথিবীর বুক ফেটে শতচির হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকটা ফাটল থেকে রক্তজটার ঝাঁকানি দিয়ে উল্লম্ফে বেরিয়ে পড়ছে অগ্নি-পিশাচেরা, বুঝি-বা পায়ের তলায় টেনে নামাবার জন্য বার্টদের এই পলাতক প্লেনখানাকেই।

কেউ বলল দেশে দেশে মজুদ পারমাণবিক বোমার গাদায় গাদায় বিস্ফোরণ ঘটেছে এক সাথে। কেউ আবার তর্ক তুলল—তা যদি হত, পৃথিবী ফাটত না; নীহারিকার আকারে জ্বলতে জ্বলতে ক্রমশঃ বিলুপ্তির মুখে এগিয়ে যেত। আসল কথা, কেউই কিছু বুঝতে পারে নি। স্রেফ এইটুকু ছাড়া যে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে পৃথিবী, নুড়ির মত ক্ষুদে ক্ষুদে গ্রহাণুর আকারে বিস্তীর্ণ এক বলয় রচনা করেছে সূর্যের চারদিকে অনন্তকাল ধরে ঘুরপাক খাওয়ার জন্য।

জননী ধরণীর অপঘাত মৃত্যু চোখে দেখেও কিন্তু বিশ্বাস করতে মন চায় নি অনেকের। চায় নি বার্টেরও। অনেকের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সেও দাবি তুলেছিল—বিমান পৃথিবীতে ফিরিয়ে নেওয়া হোক। পৃথিবীতে, মানে যেখানটাতে ছিল পৃথিবী, সেই জায়গাটাতে। কী হল—তা দেখা উচিত। যদি কোন দিক দিয়ে সাহায্য করা যায়, তাও করা উচিত। বিমানের অধ্যক্ষ কিন্তু সায় দেয় নি বার্টদের প্রস্তাবে। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে ফিরে যাওয়া শুধু নিরর্থক নয়, বিপজ্জনকও।

বিপজ্জনক, কারণ পৃথিবী নেই, তার সে আবহাওয়াও নিশ্চয়ই নেই, সেখানে ফিরে গেলে, অন্য কোনভাবে না হলেও নিশ্বাস নেবার মত বাতাসের অভাবেই মারা পড়তে হবে। মঙ্গলে যাওয়ার জন্য বেরুনো হয়েছে, মঙ্গলেই যাওয়া যাক। সেখানে উপনিবেশ আছে। হাজার দুই মানুষ আছে সেখানে। পৃথিবীরই মানুষ, শতাধিক বৎসর তারা বাস করছে সেখানে, পৃথিবীর সভ্যতারই একটা ধারা সেখানে বইছে, তা সে ধারার প্রবাহ যত ক্ষীণই হোক।

মঙ্গলে পৌঁছোলো তারা। আরও আরও বিমান এসে নামতে লাগল, একটা একটা করে। পৃথিবী থেকে এরা অভিযানে বেরিয়েছিল—কেউ শুক্রে, কেউ বৃহস্পতির কোন একটা চন্দ্রে, কেউ বা অন্য কোথাও। কেউ বাণিজ্যিক ব্যাপারে, কেউ উপনিবেশ স্থাপনের যোগ্য নতুন কোন গ্রহ আবিষ্কারের আশায়, কেউ বা শুধুই বৈজ্ঞানিক গবেষণার দায়িত্ব নিয়ে। এরা ফিরে এল মঙ্গলে, কারণ পৃথিবী নেই, এবং মঙ্গলই হল একমাত্র গ্রহ, যেখানে পৃথিবীর জীবনের স্বাদ খানিকটা পেতে পারে পৃথিবীর মানুষ। যেমন ঘোল খেয়ে দুধের স্বাদ আন্দাজ করার চেষ্টা করে অনেকে।

একুশ বছর বয়সে বার্ট নেমেছিল মঙ্গলে, এখন তার বয়স পঁয়ত্রিশ। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর। মানুষটা সে বরাবরই ভবঘুরে প্রকৃতির, দুঃসাহসিক। মঙ্গলের উপনিবেশে ক্রমোন্নতির যে প্রেরণা আগে আসত পৃথিবী থেকে, তার উৎস এখন শুষ্ক। সে অভাবের ফল হয়েছে মারাত্মক। উপনিবেশীরা উদ্যম হারিয়ে ফেলেছে। দুই ডজন বিমান অলস হয়ে পড়ে আছে, একটাও আকাশে ওড়ায় না কেউ!

চাষবাস, ঘরবাড়ি-গড়া, অল্পস্বল্প কারিগরি—যেটুকু নইলে গেরস্তালির কাজই অচল হয়ে পড়ে, এই নিয়েই তুষ্ট আজকাল উপনিবেশীরা। কোথায় গেল খনি খুঁড়ে পাথর তোলা, কোথায় গেল মেরুতে মেরুতে ঘুরে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করা। দিনের অর্ধেক কাটে ঘুমে, সিকি ক্লাবে, বাকী সিকিটুকু সময় একান্ত অনিচ্ছুক ভাবেই ওরা কাজ করে। যে কাজটুকু না করলে চলবেই না, সেইটুকুই শুধু।

এ জীবন বরদাস্ত হয় নি বার্ট-এর। তাই সে উপনিবেশে টিকতে পারে না। তাই সে বেরিয়ে পড়ে খালে খালে বিচরণ করবার জন্য। এ মোটর বোট তার নিজের হাতে তৈরী। দুই বৎসর লেগেছিল তৈরি করতে, কারণ বোট তৈরি করার রেওয়াজ নেই এখানে, জানে না কেউ ও-বিদ্যে। বার্টই কি জানত? না জেনেও সে গড়ে তুলেছে একখানা। দেখতে মোটেই ভাল হয় নি, কিন্তু কাজ দেয় সুন্দর।

উপনিবেশীরা মনে করে—বার্ট একটা আধ-পাগলা।

আজ দশ বৎসর খালে খালে ঘুরছে বার্ট। গিয়েছে মঙ্গলের সব অঞ্চলে, ঢুকেছে নানা সম্প্রদায়ের ঘরোয়া মহলে। চৌদ্দটা ভাষা চালু রয়েছে মঙ্গলবাসীদের ভিতরে। তার মধ্যে চারটি ভাষায় বার্ট কথা কইতে পারে মঙ্গলীদেরই মত, বাকী দশটাতেও কাজ চালিয়ে নিতে পারে মোটামুটি রকমে।

কোন বাড়িতে প্রথমবার যখন যায় বার্ট, বাড়ির লোকগুলির নাম লিখে নেয় খাতায়। দ্বিতীয় বার সেখানে যাওয়ার আগে সেই নামগুলি পড়ে নেয় একবার। ফলে যখনই যেখানে যাক, অন্তরঙ্গ ভাবে কথা কইতে পারে সকলের সঙ্গে। এমন লোককে কে না ভালবাসবে? যেখানে যায় বার্ট, সেইখানেই তার সমাদর। তার কাজের খাতিরে নয়, তার স্বভাবের খাতিরে।

অ্যানিকার বাড়িতে বোট ভিড়িয়ে বার্ট ডাঙ্গায় নামল পাঁচ দিনের দিন। একটা ঝোলায় ঝালাইয়ের যন্ত্রপাতি, পরনে ছেঁড়া পোশাক, পায়ে ছেঁড়া জুতো। নিজের হাতে তৈরী জিনিস, কারণ কিনতে ত পাওয়া যায় না ওসব। আগে ওসব জিনিস চালান আসত পৃথিবী থেকে। এখন ত আর আসে না। অথচ এখানে ওসব তৈরি করবার মত কল-কারখানা গড়ে উঠেনি, উঠবেও না কোনদিন। গড়বে কে? উপনিবেশীদের উৎসাহ কোথায়?

মঙ্গলের সব বাড়ি যেমন, অ্যানিকার বাড়িও তেমনি ভাঙ্গা। বড় কত্তারা গড়ে গিয়েছিলেন এসব বাড়ি,সেই কত শতাব্দী আগে। নীরেট পাথরে গড়া হলেও উপর-তলাটা ভাঙ্গা, অব্যবহার্য। নীচের তলায় অনেক ঘর। বসবাসের জন্য আর কয়টা কামরা দরকার হতে পারে ? দুই একখানা গোলাঘর হিসেবে ব্যবহার হয়, বাকী সব পড়ে থাকে বন্ধ হয়ে।

বন্ধ থাকে বলেই যে খালি থাকে, তা কিন্তু নয়। প্রত্যেকটা ঘরে দশ বিশটা করে বেনিকুকের আড্ডা। অনেকটা পৃথিবীর কাঠবিড়ালের মত। তফাৎ এই, এরা সব পোষমানা। আর মস্ত গুণ, কোন ক্ষতি করে না গেরস্তর। হাতে করে ছড়িয়ে না দিলে কোন জিনিস খাবে না। মানুষের আদরের ভিখিরী, আদর করেও মানুষকে। গৃহপালিত জীব বলতে মঙ্গলে বেনিকুকেরাই।

বার্ট ডাঙ্গায় নামল পাঁচ দিনের দিন। [পৃষ্ঠা ৪৩০

বার্ট জানে তা। তাই তার মোটরবোটে বড় একবস্তা চীনে বাদাম থাকে প্রতিবারই। যে কোন বাড়িতে উঠবার আগে পকেটে সে কয়েক মুঠো বাদাম ভরে নেয়, আর বাড়ির ভিতর ঢুকবার আগে ওগুলো ছড়িয়ে দেয় বেনিকুকদের জন্য। দেখতে দেখতে দলে দলে ছুটে আসে আদুরে বেনিকুকেরা, এক একটা করে বাদাম মুখে নিয়ে পরস্পরে রেষারেষি শুরু করে বার্ট-এর কাঁধে চড়ে বসবার জন্য।

আগে দোরগোড়ায় বাদাম ছড়িয়ে দিয়ে তারপর অ্যানিকার দিকে তাকাল বার্ট। অ্যানিকা ওদিকে দাঁড়িয়ে যবুই গুঁড়ো করছে হাত-ঢেঁকিতে, পৃথিবীর যবেরই এক বন্য সংস্করণ ঐ যবুই। যবুই নামটাও উপনিবেশীদের দেওয়া। আদিবাসীদের ভিতরে ওর অন্য নাম আছে—কুহিলাং-বিট্রো।

অ্যানিকার মুখ অন্যদিকে ফেরানো, কাজেই বার্টকে সে এতক্ষণ দেখতে পায় নি। এইবার বেনিকুকদের উল্লাসের চেঁচামেচি শুনে সে ফিরে তাকাল। সমুখে অতিথি দেখেই মুখে হাসি ফুটিয়ে সম্ভাষণ জানাল—"এসো, এসো, পৃথিবীর মানুষ, কয়দিন থেকেই ভাবছি—তোমার আসার সময় হল আবার। আছ ত ভাল ?"

নিজের কুশল সংবাদ জানাবার পরে নাম ধরে ধরে এ-বাড়ির প্রত্যেকের খবর জিজ্ঞাসা করতে লাগল বার্ট। যবুই গুঁড়ো করতে করতে অ্যানিকাও জবাব দিতে থাকল হাসিমুখে। "বড় কত্তারা এ-গরিবদের মনে রেখেছেন বাবা! তাঁদের দয়ায় সবকিছু ভালই যাচ্ছে। ফসল উঠেছে ভাল, তবে ক্ষেতগুলো কতক-কতক পড়ে থাকছে ত! চষে তুলবার লোক কই? সব জমি চষতে পারলে আমি এর চেয়ে তিনগুণ ফসল পেতাম। ঐ একটা ছেলে টামনাক, ও আর কত করবে? বড় মেয়ে গুইকার স্বামীকে ধরে আনতে হয়েছে কয়েকদিন ব্যাগার দিয়ে যাওয়ার জন্য। তা ওকে ত আর প্রতিবারই পাব না! নিজের খামার আছে ত ওর!"

হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে নিয়ে অ্যানিকা বলল—"এবার তোমার জন্য বড় কাজ একটা রেখেছি বাবা! বাসনকোসন যন্তরপাতি যেমন প্রতিবারই কিছু কিছু থাকে, এবারও রয়েছে তেমনি। কিন্তু আসলে ঠেকে গিয়েছি বড় ঘরখানার দরজা নিয়ে। একটা পাল্লা ওর খুলে গিয়েছে। টামনাক অনেক মেহনত করেছে, কিন্তু লাগাতে পারে নি ঠিকমত। আসলে কারিগরি জিনিসটা আসে না এ দেশের মানুষের। তোমরা পৃথিবীর মানুষেরা কী চমৎকার কাজ কর যে ওসব দিকে! কত অল্প সময়ে কী মজবুদ মেরামত! না, কারিগরিতে মঙ্গলের লোক কিছু নয়।"

বার্ট অবাক হয়ে ভাবে—মঙ্গলের মেয়ের মুখে এই কথা? কারিগরিতে মঙ্গলের লোক কিছু না? তা হলে ঐ বিরাট বিরাট খাল কারা খুঁড়েছিল মঙ্গলে? বড় কত্তারা কি মানুষ ছিলেন না?

অ্যানিকার মুখের কথা আবারও মোড় খেয়েছে—"তুমি কেন যে এমন ছন্নছাড়ার মত ঘুরে ঘুরে বেড়াও? থাকো না! ঘাঁটি হয়ে আমার কাছে থাকো না! এত ক্ষেত খামার, অর্ধেক আমি তোমায় দিয়ে দেব। ঐ জাইলোটা রয়েছে, আমার ছোট মেয়ে—"

জাইলো? হ্যাঁ, তিনমাস আগেও জাইলোকে দেখেছে বার্ট। পৃথিবীতে মেয়েদের সৌন্দর্যের মাপকাঠি অবশ্য একটু অন্যরকম, তা হলেও জাইলোকে দেখতে বেশ ভালই। আর স্বভাব? স্বভাবটি ওর ভারী মিষ্টি!

খাওয়ার সময় জাইলো পাশেই বসল। কথা এমন কিছু বলে নি সে, কিন্তু—না, নিজেকে দুর্বল হতে দেওয়া চলবে না। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল বার্ট। বাইরে গিয়ে আগুন জ্বালল একটু, আর শুরু করল একটার পর একটা বাসনের ঝালাইয়ের কাজ। মাথা নীচু করেই কাজ করে যাচ্ছিল, হঠাৎ একসময়ে কী যেন মনে করে সে মাথা তুলল, আর তুলতেই দেখল—অদূরে বসে আছে জাইলো, ডাগর আঁখির দৃষ্টি খালের জলে ভাসমান বোটখানার দিকে নিবদ্ধ করে।

"দরজাটা মেরামত করে আসি"—বলে বার্ট তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

পরদিন সকালে অ্যানিকারা আবিষ্কার করল—বার্ট চলে গিয়েছে রাত থাকতেই। তার পাওনাগণ্ডাও নিয়ে যায় নি। পাওনাগণ্ডা মানে মুদ্রা নয় কোন রকমের। উপনিবেশের বাইরে মুদ্রার চল নেই কোথাও। নিজের পারিশ্রমিক হিসেবে সামান্য খাদ্যসামগ্রী ছাড়া বার্ট কিছু নেয় না।

জাইলোর বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে অ্যানিকা মৃদুস্বরে বলল—"ও আসবে আবার। বরাতে ওর আরও কিছু কষ্ট আছে। সেটার ভোগ শেষ না হলে ঠাণ্ডা হয়ে বসবে কেমন করে?"

অ্যানিকার খামার থেকে ফিরতি-পথে প্রথমেই পড়ে বাঁয়ের দিকে ফার্গাস-এর খামার। সেখানে পৌঁছোলো দুপুর নাগাদ। এসেই নতুন খবর পেলো বার্ট। চৌদ্দ বছর পরে মঙ্গলের আকাশে বিমান দেখা গিয়েছিল কাল রাত্রে। ফার্গাস দেখেছে। কোথাকার বিমান হতে পারে? পৃথিবী আর নেই, এখন মঙ্গলে বিমান পাঠাবে কে?

বার্ট বলল—"অন্য কোন গ্রহ, যার ভাঁড়ারে পৃথিবীরই পুরোনো বিমান মজুদ আছে এখনো।"

ফার্গাস-এর বাড়িতে ঝালাইয়ের কাজগুলো চটপট সেরে ফেলল বার্ট, তারপর না খেয়েই বিদায় নিল ওখান থেকে। ওরা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে দেখে সান্ত্বনা দিল এই বলে—"বুঝছ না বন্ধু, কোন্ গ্রহ থেকে কী খবর এল, জানা ত দরকার। নিজে হাজির থেকে জানা হল একরকম, আর ওরা চলে যাবার পরে উপনিবেশীদের মুখে ঝাল খাওয়া হল অন্যরকম। পরের বার এসে খাঁটী খবর দিতে পারব তোমাদের।"

পাঁচদিন লাগল উপনিবেশে ফিরতে।

বিমান সত্যিই এসেছে। শুক্র থেকে। পৃথিবীর উপনিবেশ শুক্রেও ছিল, তা অজানা নয় বার্ট-এর। যেমন মঙ্গলে, তেমনি শুক্রেও দুই হাজার উপনিবেশী পাঠিয়েছিল তার মাতৃভূমি ঐ পৃথিবী। এমন আরও কত কত গ্রহে পাঠিয়েছিল, অপরাপর সৌরমণ্ডলে, অপরাপর ছায়াপথে, তার পুরোপুরি হিসাব আজ কে রাখে?

শুক্র ত এই সৌরমণ্ডলেই! বলতে গেলে প্রতিবেশী! ইচ্ছে করলে অনেকদিন আগেই তারা যোগাযোগ করতে পারত মঙ্গলের সঙ্গে। যেমন পারত শুক্রের সঙ্গে মঙ্গলের উপনিবেশীরাও, যদি সে উদ্যম তাদের থাকত।

শুক্র থেকে বিমান এসেছে রুদারফোর্ড এ-৪। আটজন বৈমানিক ওতে। তাদের নেতা যে, দাড়িওয়ালা ঢ্যাঙ্গা-পানা লোক একটা, আজ পাঁচদিন যাবৎ চষে বেড়াচ্ছে উপনিবেশটা। সে একটা বিশেষ মতলব নিয়ে এসেছে। এখান থেকে সে লোক নিয়ে

যেতে চায় শুক্রে। যত লোক যেতে চাইবে, নিতে রাজী সে। ওখানে কাজ চলেছে পুরোদমে। শুক্রের মানুষ মঙ্গলের মানুষের মত আয়েসী নয়, শুয়ে বসে গুল্‌তুনি করে করে দিনের দিন নিঃশব্দে কবরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না।

না, তা যাচ্ছে না তারা। পৃথিবী আজ নেই, শুক্রের মাটিতে নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দ্বিতীয় আর এক পৃথিবী, জ্ঞানে বিজ্ঞানে সমুন্নত, সুসভ্য, সমৃদ্ধ, কর্মচঞ্চল, প্রাণশক্তিতে ভরপুর। এ মহৎ প্রচেষ্টাকে রূপায়িত করার পক্ষে জনসংখ্যা তাদের পর্যাপ্ত নয়। মাত্র দুই হাজার। তাতে নারীর অনুপাত কম আবার। বংশবৃদ্ধি মন্থর। তাই তারা মঙ্গলের দ্বারস্থ। আড্ডার মায়া কাটিয়ে যারা শুক্রে যেতে চাইবে, আদর করে তাদের নিয়ে যাবে রুদারফোর্ডের কাপ্তেন। যতজন যেতে চাইবে, ততজনকেই নেবে। দরকার হলে বার বার আসবে সে।

বার্ট নাম লিখিয়ে ফেলল। অন্য চারজন উপনিবেশীর সঙ্গে রুদারফোর্ডে উঠে বসল সে শুক্রে পাড়ি জমাবার জন্য। মঙ্গলে জীবনপ্রবাহ স্তিমিত, সে জীবন-মরণের কোলে ঢলে পড়ছে দিনের দিন। ওদিকে শুক্রের বৃষ্টিঝঞ্ঝা তুষারবর্ষণের নীচে অহোরাত্র উঠছে রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি, প্রতিকূল প্রকৃতিকে মরণপণ যুদ্ধে পরাজিত করে করে পৃথিবীর বীর সন্তানেরা বিজয়কেতন উড়িয়ে দিচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে, খনিগর্ভে, পর্বতচূড়ায়, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে।

জয় শুক্রবাসীর জয়! ওদেরই সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে জীবনের জয়গান গাইবে বার্ট।

শুক্রে পৌঁছোবার পরই বার্ট বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল তার চার সঙ্গীর কাছ থেকে। দল বেঁধে কাজ করবার জন্য আনা হয় নি তাদের। সাধারণ কর্মী ত তারা নয়। পৃথিবীর মানুষ যত আছে এ-গ্রহে, কেউই তারা গায়ে গতরে মেহনত করে না। প্রত্যেকেই এক একটা দলের খবরদারির ভার পেয়েছে, বলতে গেলে ক্ষুদে এক একটা সেনাপতি তারা প্রত্যেকে।

এরা যদি সেনাপতি, তাহলে সৈনিক কারা? গায়ে গতরে খাটুনিটা খাটে কারা?

গ্রিফারা। শুক্রের আদিবাসী বামনজাতীয় জীবেরা। মানুষেরই মত, তবে গায়ে লম্বা সাদা লোম তাদের। আর লম্বায় তিন ফুটের বেশী হয় না। পৃথিবী যতদিন ছিল, শুক্র থেকে রপ্তানির প্রধান জিনিস ছিল গ্রিফাদের গায়ের ঐ লোম, অমন উজ্জ্বল শুভ্র পশম পৃথিবীর কোন জন্তু জানোয়ারদের দেহ থেকে পাওয়া যায় নি কোনদিন।

গ্রিফারা বনে জঙ্গলে থাকে, সংখ্যায় তারা কোটি কোটি। বনে ঢুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে আনলেই হয়। অত্যন্ত ভীতু, নিরীহ জীব ওরা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কথা মগজেই আসে না তাদের।

মানুষেরা তাদের লাথে লাথে ধরে আনে যখন তখন। পঞ্চাশ থেকে একশোটা গ্রিফার এক একটা দল ছেড়ে দেয় এক একজন দলপতির হাতে, সে ওদের খাটায়, যতদিন না খাটতে খাটতে শ্রান্ত হয়ে ওরা মারা পড়ে।

বলা বাহুল্য দলপতিরা প্রত্যেকেই পৃথিবীর মানুষ। তাদের উপর কড়া হুকুম রয়েছে—দয়া নয়, মায়া নয়, একটা গ্রিফাও যেন এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম না পায়। দেড়ে-মুশে কাজ আদায় কর। কাজ করতে করতে যেটা মরে যাবে, সেটাকে টেনে ফেলে দিয়ে সেখানে আর একটাকে বহাল কর। বনে গ্রিফার অভাব নেই; একটা মরলে দশটা পাওয়া যাবে।

গ্রিফারা আকারের অনুপাতে দুর্বল নয়, তা ছাড়া নির্বোধও নয়ই। যে কোন কাজ একবার বুঝিয়ে দিলে তারা বুঝতে পারে, আর কাজটা যত শ্রমসাধ্যই হোক, বহু জনের মিলিত চেষ্টায় তা সমাধা করে তোলেই। অবাধ্য নয়, উগ্র নয়, চাবুক তুললেই ভয়ার্ত করুণ দৃষ্টিতে দলপতির দিকে তাকিয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। একজনের উপরে তুললে কাঁপতে থাকে একসঙ্গে পঞ্চাশটা।

চাবুকের প্রয়োগে ঢিলেমি করলে চলবে না, উপরওয়ালাদের কড়া হুকুম। গ্রিফাদেরই হাড় পাঁজরার উপরে গেঁথে তুলতে হবে শুক্রের বুকে পৃথিবীর সভ্যতা। বার্ট একদিন তর্ক তুলেছিল এক সহকর্মীর সাথে। সে-সহকর্মী আগের আমলের উপনিবেশী, নিষ্ঠুরতার আর হিংস্রতার কট্টর সমর্থক।

বার্টের বক্তব্য ছিল—মানুষ তার নিজের সমৃদ্ধির জন্য গ্রিফাদের সমূলে ধ্বংস করে যদি, সেটা চরম অন্যায় হবে।

সে উত্তর পেয়েছিল মুখের মতন—এক জাতির উপরে শোষণ আর পীড়ন চালাতে না পারলে আর এক জাত বড় হতে পারে না কখনও। কোথাও যে কোন জাত পেরেছে তা, ইতিহাসে এমন নজির নেই। গ্রিফাদের উপর দয়া করতে গেলে শুক্রের মানুষ বড় হতে পারবে না কোনদিন।

সহকর্মী তাকে উপদেশও দিয়েছিল খানিকটা—"তুমি শুক্রে এসেছ। শুক্রের নাগরিক অধিকার এখনও পাও নি। সেটা পেতে হবে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে। শুক্রের মানুষেরা নিজেদের জন্য সমাজনীতি রাজনীতি বেঁধে নিয়েছে আগেই, বেছে নিয়েছে নির্দিষ্ট একটা কর্মসূচি। তোমায় যদি যোগ্যতার পরিচয় দিতে হয়, তা হলে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হবে সেই নীতি আর সেই সূচি। না করলে—"

"না করলে কী হবে?" একটু উষ্ণ ভাবেই প্রশ্ন করেছিল বার্ট+

উত্তর পেয়েছিল—"না করলে দেখতে পাবে যে মঙ্গল থেকে আসা তোমার বিফল হয়েছে। শুধু বিফল নয়, মারাত্মকও।"

কীভাবে মারাত্মক, তা আর খুলে বলে নি সহকর্মী, তবে আন্দাজ করে নিতে কষ্ট হয় নি বার্টের। "কাজ করব না" বললেই যে এরা ফিরে যেতে দেবে তাকে, এমন আশা না করাই ভাল। মঙ্গলে গিয়ে সে শুক্রবাসীদের নিন্দা ছড়িয়ে বেড়াবে, এমন সুযোগ তাকে কিছুতেই দেবে না এরা। তাহলে ?

অনুশোচনায় নিজের হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছে করে বার্ট-এর। গ্রিফাদের রক্ত মাংসে যে-সভ্যতার বনিয়াদ তৈরী হচ্ছে শুক্রের বুকে, তার অংশীদার হতে পারা কি এমনই একটা বাঞ্ছনীয় বস্তু যে তারই লোভে মঙ্গলের শান্ত নিরুদ্বেগ জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে আসার দরকার ছিল ? না থাকুক সে-জীবনে উচ্চাশার উন্মাদনা, উদ্দাম লালসার আস্ফালনও ত ছিল না ! সে-জীবন যদি ছিল অলস, এ-জীবন যে দস্তুরমত পঙ্কিল !

এই যখন তার মনের ভাব, তখনই একদিন তার কাজ পড়ল পাহাড়ের গায়ের এক নতুন খামারে। উপনিবেশ থেকে দেড়শো মাইল দূর। রাত্রি শেষে গাড়ি এসে তাকে তুলে নিয়ে গেল কর্মস্থানে পৌঁছে দেবার জন্য। শুক্রবাসীরা বিরাট বিরাট মোটর গাড়ি চালায় বিদ্যুতের শক্তিতে, সে বিদ্যুৎ তৈরী হয় গাড়ির ভিতরেই।

ঝমঝম বৃষ্টি, সোঁ সোঁ ঝড়। শুক্রের বারোমেসে আবহাওয়াই এই। তারই মধ্যে বর্ষাতি গায়ে টুপি মাথায় রবারের বুট পায়ে বার্ট দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ চাবুক হাতে। গোটা পঞ্চাশ ষাট গ্রিফা কাজ করছে তার সামনে। তিন তিন জন করে এক সাথে শিকলে বাঁধা। যাতে পালাতে না পারে, তারই জন্য এ-ব্যবস্থা।

খামার ? খামার এখনো হয়নি এখানে। পাহাড়ের ঢালু গায়ে বড় বড় পাথরের চাঙ্গা পড়ে আছে। সেগুলো ঠেলে সরিয়ে দিতে হবে প্রথমে। রাখতে হবে গাদা করে। ট্রাক আসবে সন্ধ্যায়, তখন সেই সব পাথর তুলে দিতে হবে ট্রাকে। চলে যাবে সে সব অন্য কোথাও, যেখানে পাথর নেই, অথচ ইমারত গড়বার বা রাস্তা বানাবার জন্য পাথর দরকার।

পাহাড়ের গায়ে যখন পাথর একখানাও থাকবে না আর, তখন সেখানে লাঙ্গল চালাবে গ্রিফারা, তারপর হবে খামারের পত্তন।

বার্ট একটু অন্য দিকে তাকিয়ে থাকতেই ভালবাসে। ক্ষুদে জীবগুলোর ভারী ভারী পাথর নিয়ে টানাটানি—এ দেখতে গেলেই কষ্ট হয় তার।

তেমনিই তাকিয়ে আছে সে। হঠাৎ যেন বাজ ডেকে উঠল অদূরে—"হেই জানোয়ারগুলো ! কাজে ঢিলেমি করছিস্ ?"

বার্ট তাকিয়ে দেখল—উপরওয়ালা সমুখে। এরও হাতে চাবুক, কিন্তু কোমরে একটা পিস্তলও। ঐ পিস্তলই পরিচয় দিচ্ছে, দলপতিদের উপরেও এ হল পরিদর্শক।

"তুমি ত কিছুই দেখছ না হে?"—বার্টের উপরে তর্জন শুরু করল সে—"জানোয়ারগুলো যে ডাহা ফাঁকি দিচ্ছে! এইভাবে তুমি নাগরিক অধিকার পাবে ভেবেছ?"

যেহেতু বার্টকে চাবুক মারা চলে না, সেই জন্যই বোধহয় পরিদর্শক চাবুক তুলল গ্রিফাদের উপরে। বারো ফুট লম্বা চাবুকের ফালিটা সোঁ সোঁ করে হাওয়ায় ঘুরপাক খেলো একটা। তারপর সপাং করে পড়ল গিয়ে একটা মেয়ে গ্রিফার গলায়। সাদা লোমের তলা দিয়ে রক্ত ছুটল ফিন্‌কি দিয়ে, গ্রিফাটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

চাবুক পড়ল গিয়ে পরিদর্শকের গলায়।

রক্ত দেখে বোধহয় রক্তের নেশাতেই মেতে উঠল পরিদর্শক। চাবুকের পরে চাবুক সে হাঁকাতে লাগল গ্রিফাদের উপরে। শিকল-বাঁধা পায়ে দৌড়োবার ব্যর্থ চেষ্টা ওদের, কান্নাকাটি, চেঁচামেচি—

হঠাৎ সাঁ সাঁ করে দ্বিতীয় একখানা চাবুক চক্কোর দিল হাওয়ায়। এ-চাবুক বার্ট-এর। এ-চাবুক পড়ল গিয়ে পরিদর্শকের গলায়। তিন পেঁচ জড়িয়ে গেল চোখের পলকে। তখন এক হ্যাঁচকা টানে তাকে মাটিতে ফেলে দিল বার্ট। পরিদর্শক শুয়ে শুয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে পিস্তলটা কোমর থেকে হাতে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। বার্ট তখন রক্ত দেখছে চোখে। সে এক দৌড়ে ছুটে গিয়ে পিস্তলটা কেড়ে নিল, আর তারই এক গুলিতে পরিদর্শকের মাথার খুলি উড়িয়ে দিল।

তারপর তার প্রথম কাজ হল গ্রিফাদের শিকল খুলে দেওয়া। তারা স্তম্ভিত

হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। "শ্যু!"—বলে দুই হাত নেড়ে ওদের পালাতে বলল বার্ট। ওরা দৌড়ে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকল।

বার্ট-এর দ্বিতীয় কাজ হল—পাথরের গাদার উপরে বসে ট্রাকের প্রতীক্ষা করা। ট্রাকেই সে ফিরে যাবে উপনিবেশে। সাথে নিয়ে যাবে পরিদর্শকের মৃতদেহ। আর ঐ মরা গ্রিফাটাকেও। কর্তাদের সমুখে দুটো দেহ পাশাপাশি রেখে তার যা বলবার, তা বলবে। দণ্ড? তা ওরা দেবে নিশ্চয়ই। মৃত্যুদণ্ডই দেবে হয়ত। কিন্তু তাতে কী? বার্ট তার কর্তব্য করেছে। পৃথিবী আজ বিধ্বস্ত। কিন্তু তা বলে পৃথিবীর মানুষের আমূল মহিমা যার ভিতরে নিহিত ছিল, সেই বিবেক যে এখনও নিঃশেষে বিধ্বস্ত হয় নি, তার প্রমাণ সে দিতে পেরেছে, শুক্রের এই মদান্ধ উপনিবেশীদের কাছে।

———

মজার প্রশ্ন

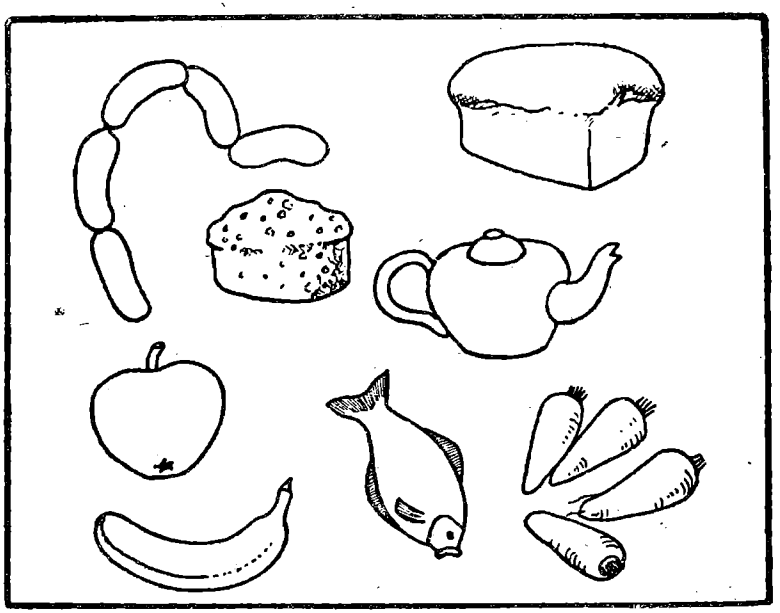

বল দেখি এদের মধ্যে কোন্ জিনিসটা দল ছাড়া একবার দেখেই চট্ করে বলে দেয় মেধাবী যারা। (না পারলে ৪৫৩ পৃষ্ঠায় দেখ)

সব্যসাচী

৪

শেষ রাত্রির একটা প্রহর উঁচু গাছের এক তেডালায় আরামে নিদ্রা গেল টারজান। তার সঙ্গী মাটিতেই রাত্রি-যাপন করার মতলবে ছিল, কিন্তু ইশারায় ইঙ্গিতে টারজান তাকে বুঝিয়ে দিল যে সে-কাজ মোটেই নিরাপদ হবে না। একটা চিতা বনের রাজার শাসানিতে ভয় পেয়ে পালিয়েছে, তা ঠিক। কিন্তু রাজা যখন ঘুমিয়ে পড়বে, তখন? চিতা যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে কারও উপরে, আগে থেকে জানান দিয়ে পড়ে না। টারজানের ঘুম ভাঙ্গার আগেই তার সাথীকে মুখে তুলে নিয়ে দ্বিতীয় কোন শীটা বনান্তরে পাড়ি দেবে। বর্ষা থেমেছে, মেঘ কেটেছে, এক ফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছিল বনভূমির এক টুকরো ফাঁকা জায়গায়। সেইখানে দাঁড়িয়ে সাথীকে বোঝাচ্ছিল টারজান। আশে পাশে ন্যুমাদের গর্জন শোনা যায়। ক্বচিৎ কোন প্রমত্ত গজরাজের বৃংহণও। সাথী বুঝল। গাছে উঠতে সে অপারগ নয়। টারজানই তাকে অন্য একটা তেডালা জুটিয়ে দিল নিজের কাছাকাছি।

সকালে ঘুম ভাঙ্গার পরে টারজান এইবার প্রথম সুযোগ পেলো তার নতুন সাথীকে পর্যবেক্ষণ করার। লোকটি শ্বেতকায়, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অত সাদা যে তাকে দেখাচ্ছিল কাল রাত্রে, সে শুধু তার দেহবর্ণের দরুন নয়। বলতে গেলে তার আপাদমস্তক হাতীর দাঁতের একটা বর্মে আবৃত। জোড়ে জোড়ে গাঁথা সেই পাতলা বর্ম লজ্জা নিবারণই শুধু করে নি তার। মুখ আর হাতের পাতা ছাড়া তার গোটা দেহটাকেই করে তুলেছে তীর বল্লম জাতীয় মামুলী অস্ত্রের অভেদ্য। অবশ্য রাইফেল

থেকে বুলেট ছুঁড়লে তার ক্রিয়া কীরকম হবে ঐ বর্মের উপরে, টারজানের পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব হল না।

ইশারা ছাড়া ভাব বিনিময়ের কোন মাধ্যম নেই। টারজান ইংরেজী জানে, ফরাসী জানে, জানে আফ্রিকার বনাঞ্চলে প্রচলিত অন্ততঃ কুড়িটা কথ্য ভাষা। তার প্রত্যেকটা সে ব্যবহার করে দেখেছে—এই হাতীর দাঁতের বর্মে-ঢাকা মানুষটার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টায়। ব্যর্থ হয়েছে প্রতিবারই। আবার ঐ মানুষটাও যখন কথা কয়েছে, একটা-মাত্র ভাষাই সে জানে বলে মনে হয়—ও যখন কথা কয়েছে, টারজান তার বিন্দুবিসর্গও পারে নি বুঝতে। আফ্রিকার বাজার-চলতি কোন ভাষার সঙ্গে তার একটুও মিল নেই।

ইশারায় ইশারায় আলাপ চালানো খুবই কষ্টের কথা। অসম্ভব হয়ত নয়, কিন্তু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তবু আশ্চর্য রকম অল্প আয়াসেই টারজান এটা বুঝে নিল নব-পরিচিতের কাছ থেকে যে কোন্ দিকটাতে সে যেতে চায়। গজদন্ত বর্মের অধিকারী অঙ্গুলিনির্দেশে দেখিয়ে দিল উত্তর দিকের সমুচ্চ গিরিশ্রেণীর পূর্ব কোণটা। শুধু আঙ্গুল তোলা নয়, আকারে ইঙ্গিতে যতরকমে সম্ভব, সে টারজানকে অনুনয় করতে লাগল সঙ্গে যাওয়ার জন্য।

টারজানের তাতে এমন কিছু আপত্তি নেই। আবিসিনিয়ার এই অজ্ঞাত উত্তরাঞ্চলে সে এসেছে বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়েই। সে উদ্দেশ্য হল এদেশের জন্তু জানোয়ার সমাজটাকে ঘনিষ্ঠভাবে নেড়ে চেড়ে দেখা। ন্যুমা, শীটা, হটা, গোগো সব অঞ্চলেই আছে আফ্রিকার। কিন্তু পূর্ব আফ্রিকার ন্যুমার সঙ্গে পশ্চিম আফ্রিকার ন্যুমা সর্বাংশে অভিন্ন নয়, আকারে প্রকারে স্বভাবে সংস্কারে বিস্তর পার্থক্য বিভিন্ন দেশবাসী বিভিন্ন গোষ্ঠীতে। হাবসি মুলুকের সিংহদের নাম-ডাক আছে লিবিয়া অঞ্চলে। সেটা শুনে অবধি প্রচণ্ড কৌতূহল রয়েছে টারজানের মনে—হাতে কলমে সে পরখ করে আসবে—আফ্রিকার অন্য সব দেশের পশুরাজদের চেয়ে হাবসি ন্যুমারা শ্রেষ্ঠ কোন্‌দিক দিয়ে।

হ্যাঁ, এই উদ্দেশ্য নিয়েই সে এসেছে। তা এ উদ্দেশ্য ত এই নতুন বন্ধুর সঙ্গে গেলেও সিদ্ধ হতে পারে। সুতরাং টারজান রাজী হয়ে গেল।

দিনের পর দিন চলে যায়, হপ্তাও কেটে যায় একটার পরে একটা। লোক দুটো এক আদি-অন্তহীন পার্বত্য অঞ্চলের অন্দর থেকে আরও অন্দরে ঢুকে যাচ্ছে ক্রমশঃ। সময়ের কোন দাম নেই, আয়েস করে করে দু'জনে অতিক্রম করে যাচ্ছে পাহাড় জঙ্গলের পথহীন পথ। দুজন চলেছে পাশাপাশি। ইশারা থেকে ভাষা পরিচয়ের পাঠ ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে টারজানের। অনেক ভাষা যে জানে, নতুন একটা ভাষা সে চট করেই আয়ত্ত করে ফেলতে পারে।

সব কিছুর আগে টারজান জেনে নিল যে তার সঙ্গীর নাম ভ্যালথর। ভ্যালথরের কৌতূহল উদ্রেক করেছে টারজানের অস্ত্রগুলি; তার তীর ধনুক আর বেঁটে বল্লম। ভ্যালথরের নিজের সঙ্গে কোন অস্ত্রই নেই। এভাবে পথ চলা বিপজ্জনক ব্যাপার। তাই পথে একদিন বিশ্রাম নিয়ে টারজান একটা তীর ধনুক আর একটা বল্লম গড়ে দিল ভ্যালথরকে।

অঙ্গুলিনির্দেশে দেখিয়ে দিল উত্তর দিকের সমুচ্চ গিরিশ্রেণীর পূর্ব কোণটা। [পৃষ্ঠা ৪৪০

দিন যায়, সপ্তাহ যায়, ওরা যে ভ্যালথরের স্বদেশের কাছে কিনারেও পৌঁছবে, এমন কোন নিদর্শন কোথাও দেখা যায় না। অনির্দিষ্ট-কালের জন্য এই বিজন পার্বত্য দেশে পর্যটনের ফলে অনাহারেও তারা মারা পড়তে পারত, যদি শিকারে সিদ্ধহস্ত না হত টারজান। হরিণ এই উঁচু পাহাড়ে তেমন মেলে না, কখনও পাখী, কখনও সজারু, কখনও বা বন্য শূকর মেরে দু'জনের উদরপূর্তির ব্যবস্থা দৈনন্দিন সে করে যাচ্ছে কোনরকমে। ও বিদ্যায় ভ্যালথর আবার আনাড়ী একেবারে।

শুধু শিকারের আনন্দই যে আজকাল একমাত্র আনন্দ টারজানের, তাও নয়। পার্বত্য প্রকৃতির অপরূপ গরিমা, অনির্বচনীয় শোভা এক এক সময়ে এমন মুগ্ধ করে ফেলে তাকে যে ধনুর্বাণ হাতে নিয়েও সে তীরক্ষেপণে দেরি করে বসে। নিসর্গ সৌন্দর্য এখানে মানুষের হস্তক্ষেপে কলুষিত হয় নি। প্রকৃতির সন্তান টারজানের আশা মেটে না সে সৌন্দর্য-সুধা অহরহ পান করেও।

টারজান আনন্দেই আছে, কিন্তু ভ্যালথর অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। একদিন পড়ন্ত

বেলায় তারা এক সংকীর্ণ উপত্যকায় গিয়ে হাজির হল, যেখানে সমুখে এগিয়ে যাওয়ার কোন উপায়ই নেই আর। একমাত্র পিছনপানেই পথ আছে, যেপথ এইমাত্র তাদের এনে পৌঁছে দিল তিন দিকে পাহাড়ে-ঘেরা এই কানা গলির ভিতরে। এইবার হাল ছেড়ে দিয়ে ভ্যালথর বসে পড়ল। "পথ হারিয়েছি"—সংক্ষেপে স্বীকার করল সে।

টারজান জবাব দিল—"তা আমি বুঝতে পেরেছি বেশ কয়েকদিন আগেই।"

ভ্যালথর অবাক্ হয়ে তাকাল তার দিকে। "কী করে বুঝলে? কোন্ দিকে আমার দেশ, তুমি ত কিছুই জান না!"

"না, তা জানি না।"—বলল টারজান—"কিন্তু এটা আমি লক্ষ্য করেছি যে গত কয়েকদিন ধরে তুমি কেবলই দিক পালটাচ্ছ। দশ দিকের শুধু ঊর্ধ্ব আর অধঃ বাদ দিয়ে আর আটটা দিকেই পালা করে পা চালাচ্ছ তুমি। ফলে এখন ব্যাপার এই দাঁড়িয়েছে যে সাতদিন আগে আমরা যেখানে ছিলাম, আজ আমরা তারই পাঁচ মাইলের ভিতরে ফিরে এসেছি আবার। ঐ টিলাটা পেরিয়ে যাও। সেই ছোট্ট নদীটা দেখতে পাবে, যেখানে আমি সেই বুনো ছাগল মেরে ছিলাম। আর দেখতে পাবে সেই কুঁজ-বার-করা গাছটা, যার মাথায় রাত কাটিয়েছিলাম আমরা।"

ভ্যালথর খুব সমস্যায় পড়েছে। মাথা চুলকে বলল—"তোমার কথাই হয়ত ঠিক। কিন্তু এখন করা যাবে কী?"

"তুমি গোড়ায় একদিন বলেছিলে ঐ গিরিমালার উত্তর-পূর্ব দিকে কোন এক জায়গায় তোমার দেশ। তারপর কিন্তু আমরা ক্রমাগত দক্ষিণে হেঁটেছি কিছুদিন। উঁচু পাহাড়ে অন্যদিকে পথ পাওয়া যায় নি বলে। তাহলে অবস্থা দাঁড়াল এই যে, যদি আমরা আবার উত্তর-পূর্ব দিকে ক্রমাগত হাঁটতে থাকি, তাহলে তোমার দেশের হদিস একদিন পাওয়া যাবেই।"

"এই যে পাহাড়গুলো, একটার ভিতর আর একটা ঢুকে জড়া-পল্‌টা খেয়ে আছে, অতল খদ আর দুরারোহ চড়াই যেখানে পায়ে পায়ে, আমার মাথা এরা গুলিয়ে দিয়েছে একেবারে। কী করব বল, এতখানি বয়সে থেনার থেকে আমি বেরুই নি কোনদিন—"

"থেনার বুঝি তোমার দেশের নাম?"

"হ্যাঁ, থেনার আমার দেশের নাম, তার এপিঠের দেশটা হল অন্থার। থেনার অন্থারের চারিপাশে উঁচু পাহাড় কতকগুলি আছে, আকারের দিক দিয়ে যারা বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। একবার সেই সব পাহাড়ের কোন একটাকে দেখতে পাই যদি, আর আমার দিগ্‌ভুল হবে না। কিন্তু যতক্ষণ তা না পাচ্ছি—"

"ততক্ষণ পথ দেখানোর ভার তোমার হাত থেকে আমার হাতেই তুলে নিই, কি বল?"

"তুমি যদি পার তা, আমি ত বেঁচে যাই"—বলল ভ্যালথর—"সূর্য চন্দ্রের অবস্থান দেখে দিক ঠিক করার অভ্যাস আমাদের দেশের কারও নেই। কাজেই এই পাহাড়ের গোলক ধাঁধায় সে সব আমার কোন কাজেই আসছে না।"

টারজান বলল—"আমি তোমায় উত্তর-পূর্ব দিকে ঠিকই নিয়ে যাব। কিন্তু তোমার দেশ যদি আমাদের পথে না পড়ে, কেমন করে পৌঁছোবে সেখানে?"

"চল ত উত্তর পুবে! জারাটর যদি আমাদের পথের একশো মাইলের ভিতরেও কোথাও থাকে, আমি ঠিক দেখতে পাব তাকে। আর জারাটরের চেহারা ত ভুল হওয়ার নয়! সেখান থেকে যেনার সোজা পশ্চিম।"

সুতরাং এখন থেকে পথ দেখাবার দায়িত্ব পড়ল টারজানের উপর। তার তাতে

এইবার হাল ছেড়ে দিয়ে ভ্যালথর বসে পড়ল। [পৃষ্ঠা ৪৪২

অসুবিধা নেই তেমন কিছু। আকাশে সূর্যের অবস্থানটাই কেবল মাঝে মাঝে দেখে নিতে হয় তাকে। পথ চলতে চলতে নানা কথাই বলে ভ্যালথর। মোটামুটি সে সব কথা বুঝতে পারার মত ভাষাজ্ঞান ইতিমধ্যে আরও করে নিয়েছে তার উৎসাহী শ্রোতা।

কোহেটুং অঞ্চলে সিংহ অনেক, তা ত দেখেই এসেছে টারজান। যত উত্তরে আসছে, তত কিন্তু অপ্রচুর হয়ে আসছে ওদের সংখ্যা। বর্ষা ঋতু চলেছে এখন, উঁচু

পাহাড়েও শীত আদৌ নেই। তবু নেই সিংহ। কারণ? ভ্যালথর কোন কারণ নির্ণয় করতে পারে না, কিন্তু টারজান অনুমান করে নিল একটা কিছু। অনুমানটা এই যে খাদ্যের অভাবই সিংহদের বিতাড়িত করেছে এই উঁচু পাহাড় থেকে। দুই একটা ছাগল খেয়ে কি আর সিংহের দিন চলে?

ভ্যালথর আশ্বস্ত করে টারজানকে—"সিংহের অভাবে কাতর হয়ো না বন্ধু! থেনারে অন্থারে চল ত দেখি, কত সিংহ তুমি চাও, দেব তোমায়। সেখানে একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তর আছে, তার নামই সিংহ ময়দান। গোরুর পালের মত সিংহের পাল চরে বেড়ায় সেখানে। হাওয়া খায়, খেলা করে। শিকার? শিকারের কষ্ট তাদের ভোগ করতে হয় না। তাদের খাবার রাজাই যোগান। অর্থাৎ থেনারের রাজা, অন্থারের রানী।

"পোষা সিংহ?"—অদম্য কৌতূহল টারজানের প্রশ্নে।

কৌতূহলের কারণ আছে বই কি টারজানের। পোষা সিংহ টারজানেরও আছে একটি। সেই তার মধ্য আফ্রিকার জমিদারিতে, ওয়াজিরিস্তানে। জাবালজা তার নাম। জঙ্গল থেকে তাকে সংগ্রহ করেছিল টারজান। ওর মা মারা যায় এক ঝড়ের রাতে গাছ চাপা পড়ে। তার আর্তনাদে আকৃষ্ট হয়ে টারজান গিয়ে গাছটা টেনে তোলে সিংহিনীর দেহের উপর থেকে। কিন্তু বাঁচে না সিংহিনী, তার মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে গিয়েছিল। নিকটেই জাবালজাকে পায় টারজান। ওর আকার তখন ছয়মাস বয়সের একটা বিড়াল ছানার মতই। কোলে তুলে বাড়ি নিয়ে আসে ওকে বনের রাজা।

তারপর সাত বছর কেটে গিয়েছে। জাবালজা এখন বিরাট সিংহ। সিংহ-সমাজে অতিসিংহ বলা যায় তাকে। পোষা কুকুরের মত সে টারজানের পায়ে পায়ে ঘোরে সারাক্ষণ। শিকারে সে ওস্তাদ, যুদ্ধে সে দুর্ধর্ষ। টারজানের বিশ্বাস—জাবালজার মত শক্তিমান সিংহ আফ্রিকাতে আর নেই। দেশ ছেড়ে পর্যটনে বেরুনোর সময় একবার সে ভেবেছিল জাবালজাকে সঙ্গেই আনবে। তাতে দুটি প্রাণীই থাকবে আনন্দে, টারজান ও জাবালজা। কিন্তু শেষকালে সে কল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হল টারজান। সাহস পেল না। আবিসিনিয়ার উত্তর অঞ্চলে আবহাওয়া কেমন হবে, আগে ত তা জানা ছিল না। ঠাণ্ডা যদি হয়, জাবালজা তা সইতে পারবে না হয়ত, কারণ গরম দেশের জীব সে। আর সে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, টারজানের দেশভ্রমণ ত পণ্ড হবেই, সন্তানতুল্য সিংহটাকে বাঁচাতেও হয়ত পারবে না। কারণ ওসব মহাজীবের দস্তুরই ঐ। অসুখ বড় একটা হয় না, কিন্তু হলেই প্রায়শঃ তা মারাত্মক হয়ে পড়ে।

আনেনি জাবালজাকে, তার দরুন এখন আফসোস হচ্ছে নিদারুণ। আনলে কোন অসুবিধাই হত না। এ আবহাওয়া চমৎকার, সহ্য হয়ে যেত জাবালজার। এঃ!

ভ্যালথরের মুখে হাজার সিংহের গল্প শোনে, আর মনে মনে হাসে টারজান। তার জাবালজাকে যদি একবার দেখত ভ্যালথর !

কোথায় জাবালজা আজ ?

টারজান জানে সে রয়েছে সুদূর ওয়াজিরিস্তানে। প্রভুর বিহনে একা একা বিষণ্ণ মনে ঘুরপাক খাচ্ছে খামার-অঞ্চলের মাঠে জঙ্গলে, আর থেকে থেকে করুণ বিলাপে আকাশ ফাটিয়ে ফেলছে মর্মবেদনায়। আহা ! টারজানকে বড় যে ভালবাসে ও !

টারজান ভাবছে তাই। কিন্তু সে ভাবনা তার ভুল।

বেশী দূরে নয়, কোহেটুং-এর হাওড়ের কূলেই। যেখানে শিফ্‌টাদের সঙ্গে প্রথম মুলাকাৎ হয় টারজানের, তার উলটো দিকে। জায়গাটা বনভূমি। তবে বনের মধ্যে ফাঁকা মাঠও রয়েছে এক টুকরো। সেই মাঠেরই মাঝখানে একটা মহাসিংহ দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে, সোনার বরণ দেহে প্রখর মধ্যাহ্ন রৌদ্র আগুনের মত ঝলকাচ্ছে মুহুর্মুহুঃ। সোনাদেহের উপরে কালো কেশর এক অদ্ভুত রাজকীয় গরিমায় মণ্ডিত করে দিয়েছে এই পশুরাজকে।

ওর পায়ের তলায় সদ্যনিহত মহিষের বাচ্চা একটা, বয়সে বাচ্চা হলেও কলেবরে সে লোকালয়ের যে-কোন ধাড়ী মহিষের সমকক্ষ, তাতে সন্দেহ নেই। একা সে আসেনি মাঠে, বাপ-মা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী মিলিয়ে পঞ্চাশটা মহামহিষ তাকে ঘিরেছিল একটু আগেও। দলটা বেরিয়ে এসেছিল ঐ বনের ভিতর দিকে। এখনও বনের ভিতরে ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে তাদের উদ্ধত শিং আর রক্তচক্ষু দেখতে পাচ্ছে পশুরাজ।

লাফ দিয়ে সে যখন দলটার উপরে পড়ল অরণ্য ছায়ার আঁধার থেকে, মোষগুলো যে যেদিকে পারল, ছুটে পালাল প্রাণ নিয়ে। ব্যূহবদ্ধ অবস্থায় সিংহের মোকাবিলা করতে তারা ভয় পায় না। সে-অবস্থায় যে-কোন সিংহও ভয় পায় ওদের ঘাঁটাতে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে মোষগুলো এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য তৈরী ছিল না—আচমকা হামলার মুখে পড়ে তাই পালাতে হয়েছিল তাদের।

পালাল সবাই, এই বাচ্চাটা ছাড়া। এর উপরেই লাফিয়ে পড়েছিল ন্যুমা। রক্তাক্ত দেহে নিমেষে ও ধরাশায়ী হল।

পালিয়েছিল সবাই, কিন্তু বেশীদূর যায় নি। গোঁয়ার জাত ঐ মোষেরা, সহজে হার মানার পাত্র নয়। ন্যুমার কাছেও না। বনের আশ্রয়ে ঢুকেই আবার তারা ফিরে দাঁড়িয়েছে। ঐ যে শিং উঁচিয়ে আগুন দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে আততায়ীকে। দুটো মোষ আবার বেরিয়েও এসেছে বন থেকে। একটা পুরুষ, অন্যটা স্ত্রী। ঐ মরা

বাচ্চাটারই বাবা ও মা। বাবা আবার এ-দলের যূথপতিও। মাদীটার তাড়নাতেই যে সে সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছে ঐ পশুরাজের সাথে, তা বেশ বোঝা যায়। সচরাচর এরকম ক্ষেত্রে যূথপতির কাজ হচ্ছে ব্যূহ সাজিয়ে ফেলা, যাতে দ্বিতীয় কোন শিকার মারা না পড়ে আততায়ীর থাবায়।

যূথপতি গর্গো এগিয়ে এসেছে মাঠের মাঝ-বরাবর। কি বিপুল কলেবর তার! আর কী বিশাল বাঁকানো শিং এক জোড়া! মাথা নীচু করে শিং বাগিয়ে সে খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ছে প্রচণ্ড আক্রোশে। গাঁক গাঁক ক্রুদ্ধ গর্জন বেরুচ্ছে তার গলা দিয়ে মুহুর্মুহুঃ। মাদীটারও ভঙ্গী ঠিক ঐরকমই, তবে সে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায় নি স্বামীর পাশে। স্থান নিয়েছে একটু পিছনে। পহেলা আক্রমণের অধিকার ও দায়িত্ব যূথপতিরই, জনক এবং নায়ক দুই হিসাবেই।

যূথপতি গর্গো যখন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, রক্ত-গোলকে ঘেরা বর্তুল দু'-চক্ষু যখন ভাঁটার মত ঘোরে তার, তখন তার সমুখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস খুব কম প্রাণীরই আছে। কিন্তু এই পশুরাজ, গর্গোকে আক্রমণে উদ্যত দেখেও শিকার ফেলে পিছু হটবার কোন লক্ষণ দেখাল না। যেমন ছিল, দাঁড়িয়ে রইল তেমনি। সিংহও গর্জাচ্ছে, মহিষও গর্জাচ্ছে, ঐকতানে মিলিত হওয়ার কোন কথা নয় ঐ দু'টো গর্জনের, দু'টো বিভিন্ন হুংকারে পরস্পরের সঙ্গে সংঘাত লেগে লেগে যে ভৈরব আরাবের সৃষ্টি হল সেখানে, তাতে বনচর অন্য সব জীবই ভয় খেয়ে দুদ্দাড় পালাতে লাগল গহন থেকে গহনতর অরণ্যে।

গর্গো গর্ত করে ফেলেছে পায়ের তলার মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে। এইবার সে ছুটল। অত বড় দেহ নিয়ে কোন জন্তু যে অমন দ্রুত ছুটতে পারে, এটা চোখে যে না দেখেছে, সে বিশ্বাস করবে না কখনও। সিংহটি কিন্তু তার ধাবমান বপু আর উদ্যত শৃঙ্গ দেখে একটুও ভয় পেলো না। গর্গো যখন প্রায় এসে পড়েছে তার উপরে, ন্যুমা লাফিয়ে এক পাশে সরে গিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে খাড়া হয়ে উঠল পিছনের দু'-পায়ে ভর দিয়ে। আর ভোজালির মত ধারালো নখওয়ালা যমদণ্ডের মত প্রচণ্ড থাবার প্রাণঘাতী একটি ঘা বসিয়ে দিল গর্গোর মাথার এক পাশে। মোষটা সেই ঘা খেয়ে বোঁ করে ঘুরে গেল একটা চোর্কর দিয়ে, আর তারপরই চার হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ল। তখন মাথা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে তার অঝোরঝরে, ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গিয়েছে একটা চোয়াল।

গর্গোকে আর ওঠার সময় দিল না ন্যুমা। ওর পিঠের উপর উঠল লাফিয়ে, আর ঘাড়ের পরিস্ফীত পেশীর ভিতরে বসিয়ে দিল দু'খানা করাতের মত দু'পাটি দাঁত।

সঙ্গে সঙ্গে থাবা বাড়িয়ে গর্গোর নাকটা পাকড়ে ফেলল তাই দিয়ে; আর মাথাটা বাঁকিয়ে ঘুরিয়ে টেনে আনতে লাগল নিজের দিকে। ফলে গর্গোর ঘাড়ের হাড়খানা ভেঙ্গে গেল মট্ করে।

এইবার তাকে ফেলে মাদী মোষটার দিকে ফিরল ন্যুমা। কিন্তু সে আর দাঁড়াল না। বনের ভিতরকার মোষেরা আগেই অদৃশ্য হয়েছে, এটিও অনুসরণ করল দ্রুত বেগে।

এইবার পরিতোষ করে উদরপূর্তির কর্মটি সমাধা করল ন্যুমা অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু ভোজ যখন শেষ হল, তখন সে অভ্যস্ত দিবানিদ্রার দিক দিয়েও গেল না। প্রায় তক্ষুণি আবার যাত্রা শুরু করল উত্তর পানে। দীর্ঘদিন ধরেই সে এই উত্তর দিকের যাত্রী। তার প্রভু যে উত্তরেই গিয়েছে, হাওয়া শুঁকেই তা জানতে পেরেছে জাবালজা।

(ক্রমশঃ)

পৃথিবীর নবম আশ্চর্য

ছবিতে যে লোকটিকে দেখা যাচ্ছে তাঁকে দেখতে সাধারণ মানুষের মত হলেও, মাথার মধ্যে মগজ বলে যে বস্তুটির তারতম্যের ফলে মানুষের মধ্যে বড় ছোট বৈশিষ্ট দেখা যায়, সেই মগজ বস্তুটি এই লোকটির মাথায় সাধারণের চেয়ে একটু বেশীই ছিল। তা না হলে তিনি কি বাইবেলের দুটি খণ্ডই Old Testament এবং New Testament মুখস্থ বলতে পারতেন! শুধু মুখস্থ বলা নয়, পেছন থেকে সামনের দিকেও মুখস্থ বলে যেতেন। তাছাড়া তিনি ৯টি ভাষায় পর পর ৯ জন সেক্রেটারীকে ৯টি বিষয়ে ৯টি চিঠি লিখতেন। অর্থাৎ একজনকে ডিকটেসন দিয়ে সে লেখা শেষ করার আগেই দ্বিতীয় সেক্রেটারীকে অন্য ভাষায় অন্য বিষয়ে বলতেন। এইভাবে নজন সেক্রেটারীকে নটি ভাষায় নটি চিঠি তিনি একসঙ্গে ডিকটেসেন দিতেন। লোকটির নাম জোসেফ বার্নাড ডোসেন। তিনি ছিলেন মিউনিকে ন্যাসানাল লাইব্রেরীর ডিরেকটার। *

* রিপ্লে থেকে

হাঁদা-ভোঁদার
চাকরি হলো
পেট্রোলপাম্পে লোক চাইছে! দেখি যদি কাজটা বাগাতে পারি!
তুই বাগাবি? বাগালে এই শর্মা! তুই পেট্রোলের কি জানিস?
একবার কাজে লাগিয়ে দেখুন না, নিখুঁত কাজ করে দিয়ে আপনার কাস্টমারদের কি রকম খুশি করি! ভোঁদা অবশ্য আমার সহকারী থাকবে।
ঠিক আছে! এই যে একজন কাস্টমার এসেছেন! এর গাড়ির সামনের কাঁচ ধুয়ে দাও!
নিশ্চয়ই স্যার! এই যে, এই মুহূর্তে!
মরেচে! বালতি শুদ্ধু হাত থেকে বেরিয়ে গেলো!
খদ্দের ঊর্দ্ধশ্বাসে গাড়ি ছুটিয়ে পালাবার পর
হতচ্ছাড়া গাড়োল! যে কাঁচটা লাগিয়ে দিতে হলো, তার দাম তোর মাইনে থেকে কাটা যাবে বুঝেছিস?
হ্যাঁ স্যার!
পাঁচমিনিট পরে
তিন লিটার লাগাও হে ছোকরা!
এক্ষুনি ভরে দিচ্ছি স্যার!

হাঁদা! চেয়ে দ্যাখ কি হচ্ছে!
ওহো, আমার কোট!
চিন্তার কিছু নেই, আমি এখুনি আপনার জামা শুকিয়ে দিচ্ছি!
চায়ে
ওরে বাবা! না না, জামা শুকোতে হবে না!
আঁউরস্!
হুসস সস!
উঃ নেই! খালি দুটো হাতা ছাড়া কিচ্ছু নেই! তোকে এর ফল ভুগতে হবে!
পরে
এবার পেট্রোল দেবার সময় সতর্ক থাকবো, যাতে আর আগের ব্যাপার না ঘটে! বুঝলি ভোঁদা?
ব্যস, ভর্তি করে দিয়েছি! এবার সচ্ছন্দে চালিয়ে যেতে পারেন!
কাজের ছেলে!
টা টা!
চড়াৎ!
খেয়েছে! পাইপটা তুলতে ভুলে গেছি!
জলদি জলদি! যতদিন না নতুন পাম্প তৈরি হয় ততদিন এই ভাবেই চলবে!

"৺শান্তনুকুমার পাল স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

শ্যামলী গাই

ইভারাণী মুখোপাধ্যায়

সন তারিখ দিয়ে বলতে পারব না, তবে বহুকাল আগের কথা। এক গ্রামে একটি লোক বাস করত। তার বৌ ছিল, আর ছিল দুই মেয়ে। বড় মেয়ের নাম অঞ্জনা, আর ছোট মেয়ের নাম রঞ্জনা। অঞ্জনা দেখতে মোটেই ভাল ছিল না, আর স্বভাবটাও ছিল খারাপ। সবার সঙ্গে ঝগড়া করত, তাই গ্রামের সকলে তাকে মোটেও ভালবাসত না। কিন্তু রঞ্জনা! রঞ্জনা দেখতে খুব ভালো ছিল, আর স্বভাবটাও ছিল ভারী মিষ্টি। গ্রামের সকলে রঞ্জনাকেই ভালবাসত।

হলে কি হবে, তার বাবা, মা, আর বড় বোন কিছুতেই তাকে দেখতে পারত না। নানা ছলে অঞ্জনা তার সঙ্গে ঝগড়া করত আর বাবা-মার কাছে গিয়ে রঞ্জনার বিরুদ্ধে নালিশ করে তাকে মার খাওয়াতো। আসলে রঞ্জনা দেখতে সুন্দর ছিল বলে, তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারতো না তার বড়দি অঞ্জনা। ওর সুন্দর দুধে-আলতা গায়ের রং, টানা টানা চোখ, একঢাল কোঁচকানো পিঠভর্তি কালো চুলের রাশ অঞ্জনার মনে হিংসার আগুন জ্বেলে দিত। নিজের সঙ্গে যত তুলনা করত তত তার মনে পড়ত নূতন নূতন ফন্দি। বাবা-মার কাছে রঞ্জনার বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে তাদের কান ভারী করত অঞ্জনা। নালিশ শুনে শুনে তাদের বাবা-মাও তিতিবিরক্ত হয়ে পড়েছিল ছোট মেয়ের ওপর। সংসারের যত শক্ত শক্ত কাজ, শাস্তি হিসাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল রঞ্জনার ঘাড়ে। সে কি আর কম কাজ? বাসন মাজত, ঘর ঝাঁট দিত, গোয়াল পরিষ্কার করত, অনেক রাত পর্যন্ত মা, বাবা আর দিদির পা টিপত, তারপর ছুটি পেত শোবার জন্য।

তবুও রূপের জলুশ কমল না বরং বেড়ে চলল পূর্ণিমার চাঁদের মত। অঞ্জনা আরও নূতন ফন্দী আঁটল। যেমন করেই হোক রঞ্জনাকে রোগা, গায়ের রঙ ময়লা করে দিতে হবে, যাতে কেউ ওকে সুন্দর না বলে। ভাবল সমস্ত দিন নামমাত্র খেতে দিয়ে মাঠে ফসল দেখার ভার ওকে যদি দেওয়া যায় তাহলে কেমন হয়? রোদে পুড়ে, জলে ভিজে গায়ের রঙ মলিন হবে, মাথার চুলে পড়বে জট, আধপেটা খেয়ে শরীর হবে রোগা।

আবার নালিশ, আবার কাজের চাপ বাড়ল রঞ্জনার। যে সব কাজের ভার তার উপর দেওয়া ছিল সেগুলি তো রইলই, তার উপর সামান্য মুড়ি আঁচলে বেঁধে নিয়ে বসে থাকতে হত মাঠে।

এমনি করেই দিন যায়, ক্ষেতের পাশে বটতলায় বসে মিয়ানো মুড়ি চিবুতে চিবুতে তার চোখ ফেটে জল আসে, খিদেয় পেটের মধ্যে আগুন জ্বলে যেন। একদিন সে মনের দুঃখে বসে বসে কাঁদছে, এমন সময় একটি শ্যামলা রঙের গরু তার কাছে এসে বলল, আমায় দেখে তুমি ভয় পেয়ো না। আমি হলুম শ্যামলী গাই। প্রতিদিন আমি তোমায় বসে বসে কাঁদতে দেখি, কিসের কষ্ট তোমার ?"

রঞ্জনা তাকে দেখে খুব অবাক্ হল ও অভয় পেয়ে তার দুঃখের সমস্ত কাহিনী শ্যামলী গাইটিকে বলল। তখন শ্যামলী গাইটি বলল, "এই কথা, এর জন্য এত কান্না, চল তুমি আমার সঙ্গে কত খাবার খেতে পার দেখি!" এই বলে শ্যামলী গাই তাকে পিঠে তুলে নিয়ে এক প্রকাণ্ড বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, "এই আমার বাড়ি, এর ভেতরে তুমি যাও, দেখবে আলমারিতে কত খাবার আছে ; খেয়ে নিয়ে শীঘ্র চলে এস কিন্তু।"

ঘরে ঢুকে রঞ্জনা তো অবাক্। আলমারিতে কত খাবার! চোখে-মুখে তার হাসি উপচে পড়ল এবং সে তাড়াতাড়ি সমস্ত খাবার খেয়ে নিয়ে শ্যামলী গাইয়ের পিঠে চড়ে আবার ক্ষেত পাহারা দিতে চলে গেল। এমনি করেই দিন যায়, শ্যামলী গাইয়ের দেওয়া খাবার খেয়ে রঞ্জনা দিন দিন সুন্দরী হয়ে উঠতে লাগল। তাই দেখে অঞ্জনা তার বাবাকে বলল, "দেখ বাবা, ও বাইরে কোথাও খায় মনে হচ্ছে। নইলে চেহারাটা কি এত সুন্দর হতো ?" বাপের চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। বলল, "চল কালকে গিয়ে দেখে আসি ও কোথায় খায়। তারপর ওর একদিন কি আমারই একদিন।"

পরদিন রঞ্জনা ঠিক সময়েই মাঠে গেল। ওকে অনুসরণ কোরে গেল ওর বাবা, মা ও বড়দি অঞ্জনা। যথা সময়ে শ্যামলী গাই এলো। রঞ্জনা শ্যামলী গাইয়ের ঘরে গিয়ে যেই খেতে বসেছে সেই সময়েই ঘরে প্রবেশ করল ওরা তিনজন। প্রবেশ করেই শ্যামলী গাইকে বেঁধে ফেলল, রঞ্জনাও তাদের হাতে কম মার খেল না। এরপর অঞ্জনা একটা কুড়ুল রঞ্জনার হাতে দিয়ে বলল, "তুই এক কোপে গরুটার মাথা কেটে দে নয়ত তোর মাথা কেটে দেবো।" কিন্তু রঞ্জনা কেঁদেই সারা। তাকে কাঁদতে দেখে শ্যামলী গাই কানে কানে বলল, "বোকা মেয়ে, কাঁদছ কেন, তুমি আমাকে কাটার অভিনয় করে কুড়ুলটা দূরে ছুঁড়ে দাও, তারপর সব দায়িত্ব আমার।"

রঞ্জনা শ্যামলী গাইয়ের কথামত তাই করল। শ্যামলী গাই তৈরীই ছিল, দড়ি ছিঁড়ে রঞ্জনকে নিয়ে দৌড়। দুই দিন এরকম ভাবে দৌড়ানোর পর তারা এক রাজার রাজধানীতে

রঞ্জনা শ্যামলী গাইয়ের কথামত তাই করল। [পৃষ্ঠা ৪৫১

এসে উপস্থিত হল। সেদিন ছিল বর্ষ শেষ ও বর্ষ শুরু উৎসব। এই সময় রাজভবনে খুব আনন্দ উপকরণ জোটে। মন্দিরে পূজো হয়, পূজারী স্বয়ং রাজা।

শ্যামলী গাই রঞ্জনাকে একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে বলল, "তুমি দাঁড়াও আমি এক্ষুণি তোমার জন্য পোশাক আনছি। তুমি আজকে মন্দিরে পূজো দিয়ে আসবে।"

কিছুক্ষণ পরেই সে ফিরে এল, রঞ্জনার জন্য বহুমূল্য পোশাক ও একজোড়া জুতো নিয়ে বলল, "শীঘ্র পরে নাও।"

রঞ্জনা সঙ্গে সঙ্গেই সেই পোশাক পরল ও শ্যামলী গাইয়ের পিঠে চড়ে মন্দিরে চলে এল। তাকে দেখে সবাই মোহিত। কে এই সুন্দরী। ইনি কি মানবী, না কি পরী-রাজ্যের কোন অপ্সরী। রাজার আর পূজায় মন বসল না। রঞ্জনা যখন মন্দির থেকে বেরিয়ে এল তখন রাজা তার পিছু নিলেন। কিন্তু রঞ্জনা শ্যামলী গাইয়ের পিঠে চেপে হাওয়া।

রাজা এক পাটি সোনালী-জুতো কুড়িয়ে পেয়ে মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন, "আপনি রাজ্যে রাজ্যে লোক পাঠান। যার পায়ে এ জুতো ঠিক হবে তাকেই আমি বিয়ে করব।"

রাজার লোকেরা সেই জুতো যার পায়ে হয় সেরকম মেয়ে খুঁজতে লাগল। অঞ্জনাদের গ্রামেও রাজার লোকেরা গেল। অঞ্জনা তাকে ডেকে এনে কৌশলে সেই জুতো পরে ফেলল। রাজার লোকেরা তখন তাকে রাজবাড়িতে নিয়ে গেল। রাজা

অঞ্জনার দিকে তাকালেন। কিন্তু তাঁর পছন্দ হল না, তবুও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য তিনি রঞ্জনাকে বিয়ে করবেন বলে অমাত্যদের আদেশ দিলেন বিয়ের তোড়জোড় করতে।

বিয়ের দিন বাজনা বাদ্যির বিরাট মিছিল। রাজা চলেছেন মন্দিরে প্রণাম করতে, পাশে তাঁর রানী অঞ্জনা। ছত্রধর পিছনে ছাতা ধরে আছে। বাজি ফাটছে। সানাইয়ের সুরে চারিদিক মুখরিত। হঠাৎ শ্যামলী গাই সেখানে এসে হাজির। পিঠে তার রূপালী পোশাকে এক পায়ে সোনালী জুতো পরা রঞ্জনা। শ্যামলী গাই এসে চিৎকার করে বলল, "মহারাজ আপনি ভুলে একজন ঠগীকে বিয়ে করলেন।"

"চমকে উঠলেন রাজা। এ কি কথা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শোভাযাত্রা থামাতে আদেশ দিলেন। অঞ্জনা কিন্তু শ্যামলী আর রঞ্জনাকে চিনতে পেরেছিল। সে বলল, "মহারাজা, শোভাযাত্রা থামাতে আদেশ দেবেন না।"

রাজা বললেন, "কে আসল রানী তাকে কি তুমি চেন?"

শ্যামলী বলল, "হ্যাঁ তিনি তো আমার পিঠেই চড়ে।"

সম্রাটের মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "হ্যাঁ এই ত সেই মেয়ে।"

রঞ্জনার খুশীও কম নয়। খুব ধুমধাম করে রাজা রঞ্জনাকে বরণ করলেন রানীর আসনে।

আর শ্যামলী! শ্যামলীর জন্য রাজা খুব সুন্দর একটা বাড়ি করালেন আর আরামে ভরণ-পোষণ দেবার ব্যবস্থা করলেন।

আর অঞ্জনা!

সেই হিংসুটে স্বভাবের মেয়েটির খোঁজও তারপর থেকে আর কেউ নেয়নি।

---

৪৩৮ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর

কেটলি। বাকীগুলি খাবার জিনিস।

"৺শান্তনুকুমার পাল স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

নিজের ফাঁদে

শ্রীঅশোকবরণ চক্রবর্তী

ঠাস করে দীনুর গালে একটা চড় মেরে মণ্টু বলল, "আমার নামে বদনাম দেওয়া। ফের যদি ওকথা বলবি, তো তোকে একেবারে মেরেই ফেলব।"

যাকে চড় মারা হল সেই দীনু কিন্তু দমল না মণ্টুর শাসানিতে। হোক না সে মণ্টুর থেকে ছোট, তবুও সত্যি কথা বলতে ভয় পাবে কেন? গায়ে একটু বেশী জোর থাকলেই সবকিছু হবে আর কি! তাই মার খেয়ে একটু ঝাঁঝাল কণ্ঠেই সে বলে উঠল—"বলব না তো কি! একশ' বার বলব, হাজার বার বলব। আমি তো স্বচক্ষে দেখেছি, তুই বিড়ি খেয়েছিস।"

"ফের—ফের মিথ্যে কথা!"—বলে কিল বাগিয়ে আবার এগিয়ে আসে মণ্টু।

কিন্তু মারবার সুযোগ ও আর পেল না—পেছন থেকে বাবা এসে ঘাড় ধরলেন ওর। রাগে ফেটে পড়লেন তিনি; বললেন, "এতটুকু বাচ্চা ছেলেকে মারতে তোর লজ্জা করে না, বুড়ো কোথাকার!—হ্যাঁরে দীনু, কি হয়েছে রে? ও তোকে মারছিল কেন?"

সাহস পেয়ে দীনু নির্ভয়ে বলল, "জানো কাকু, মণ্টুদা ওপাড়ার স্বপনের সঙ্গে বিড়ি খাচ্ছিল। আমি দেখতে পেয়ে বললুম, 'কাকুকে বলে দেব—তুই বিড়ি খাচ্ছিস!' সেই জন্যে ও মারল আমাকে।"

"হুঁ-উ-উ..." কাকু ঘাড় নাড়তে লাগলেন—"বুঝেছি। ছেলে ওস্তাদ হয়েছে। দাঁড়াও বিড়ি খাওয়া শেখাচ্ছি তোমার।" এই বলে ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে দীনুর কাকু অর্থাৎ মণ্টুর বাবা মণ্টুকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

অন্য দু'একজনের কাছ থেকেও তিনি ঐ একই অভিযোগ শুনেছিলেন; কিন্তু বিশ্বাস করেন নি। ভেবেছিলেন, সব মিথ্যে কথা। কিন্তু আজকে দীনুর কথা শুনে তিনি বুঝলেন তাঁর নিজের মতটাই মিথ্যে। কারণ, দীনুর মত ছেলে মিথ্যে কথা বলতে পারে না। কাজেই মণ্টু বিড়ি খেয়েছে নিশ্চয়ই!

শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি দু'তিনটে ছড়ি ভেঙ্গে ফেললেন মণ্টুর পিঠে।

এখন মণ্টুর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল ঐ দীনুর ওপর। বাবা মেরেছেন, তাঁকে তো আর কিছু বলা চলে না! কিন্তু দীনু? সে বলে দিল বলেই তো মার খেল মণ্টু। কাজেকাজেই তার এই মার খাওয়ার প্রধান কারণ, দীনু।

অতএব, মণ্টু ঠিক করল, দীনুকে একদিন মজা দেখাতে হবে। মার খাওয়ার ঠেলাটা বুঝুক বাছাধন। তবে একটা কথা—প্রকাশ্যে দীনুকে মারা চলবে না। সবাই জেনে ফেললে উলটে নিজেকেই মার খেতে হবে। কাজেই এমনভাবে দীনুকে শিক্ষা দেওয়া দরকার, যাতে সে আর কোনদিন···

সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে হাত-পা আলগা করে দিল মণ্টু। [পৃষ্ঠা ৪৫৭

সত্যি, দীনুকে হিংসে করতে ইচ্ছে করে। মা, বাবা, কাকা, কাকী, পিসী, জ্যাঠা—বাড়ির সবাই দীনুকে ভালবাসেন। আর মণ্টুকে? ওর থেকে কুকুর বেড়ালকেও বেশী ভালবাসেন ওঁরা। অথচ বেচারা মণ্টু, সে খুঁজে পায় না, কি দোষ তার! দীনু পরীক্ষায় ফার্স্ট হয় আর মণ্টুও পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়। তবে দীনু 'পাস-ডিভিসনে' ফার্স্ট আর মণ্টু 'ফেল-ডিভিসনে' ফার্স্ট! শুধু তার জন্যেই ভালবাসাবাসির এত পার্থক্য!

বেচারা মণ্টুর দুঃখ কেউ বোঝে না—বোঝে শুধু তার বন্ধু স্বপন, যে ওর পয়সায় বিড়ি কিনে খায়!

যাই হোক, দীনুকে শিক্ষা দিতেই হবে—এই ওর প্রতিজ্ঞা। কিন্তু কিভাবে শিক্ষা বা শাস্তি দেওয়া যায়? অনেক মাথা ঘামিয়েও 'ফেল-ডিভিসনে' ফার্স্ট শ্রীমান মণ্টু কোন উপায়ই বার করতে পারল না। অবশেষে গেল সে তার নিকটতম বন্ধু স্বপনের কাছে।

স্বপন যুক্তি দিল—"এক কাজ কর তুই। আমবাগানের সেই সরু রাস্তাটা দিয়ে দীনু তো স্কুলে যায় আসে?—ঐ রাস্তার মাঝখানে গোটা দুই বাবলা কাঁটা অল্প করে পুঁতে রাখবি। ব্যস! আর দেখতে হবে না, ঐ বাবলা কাঁটা দুটো ঢুকবে বাছাধনের পায়ে!"

মণ্টুর কিন্তু পছন্দ হল না যুক্তিটা। অন্য লোকের পায়ে ফুটবে, এ ভয় মণ্টু করে না। কারণ, সে আর দীনু ছাড়া ঐ পথ দিয়ে কেউই চলাফেরা করে না। (তবে এই কাঁচা আমের মরসুমে আম পাড়তে ছেলের দল আসে মাঝে মাঝে। তাদের পায়ে কাঁটা ফুটলেও ক্ষতি নেই, চোরের মা ডাক ছেড়ে কাঁদতে পারবে না!) অপছন্দের কারণ হল, সামান্য দুটো কাঁটা দীনুর পায়ে ফুটিয়ে সে তার এমন কি ক্ষতিসাধন করতে পারে!

কিন্তু অপছন্দ হলেও ঐটাই প্রয়োগ করল মণ্টু। না করেও অবশ্য উপায় ছিল না; কারণ, অন্য কোন উপায় সে খুঁজে পাচ্ছিল না। আর তাছাড়া স্বপনের মত একজন বন্ধুর কথা ঠেলাটাও একটু গর্হিত কাজ বটে!

দুঃখের বিষয়, ফাঁদ পেতেও কোন ফল পাওয়া গেল না। পাঁচ ছ' দিন অপেক্ষা করেও মণ্টু শুনতে পেল না দীনুর কাতর আর্তনাদ। নিশ্চয়ই কোন অঘটন ঘটে নি এ পর্যন্ত।

একদিন দীনু মণ্টুকে বলল, "মণ্টুদা, চল আম পাড়িগে।"

আম!

তা মন্দ বলেনি দীনু। মণ্টুর জিবে জল এল। আপাততঃ আগের মনোমালিন্যটা মিটিয়ে নিল দু'জনে—চলল আমের সন্ধানে আমবাগানে।

মণ্টুর বয়সও বেশী আর শক্তিও বেশী। গাছে উঠতে ওস্তাদ ও। বিপরীতে দীনু মোটেই গাছে উঠতে পারে না। তবে বুদ্ধিতে সে মণ্টুর থেকে অনেক পাকা। তাই আমবাগানে পৌঁছেই সে বলল, "মণ্টুদা, তুই গাছে উঠে আম পাড়, আর আমি নীচে দাঁড়িয়ে আম কুড়ুই। কাউকে একটা আমও কুড়ুতে দেব না।"

দীনুকে দেখাতে মণ্টু লাফ দিয়ে একটা আমগাছের একটা উঁচু ডাল ধরল। তারপর চামচিকের মত ঝুলে নিজেকে তুলে নিল গাছের ওপর। গাছটা ধরে একবার নাড়া দিল ও। গোটাকয়েক আম পড়ল মাটিতে।

আনন্দের সঙ্গে দীনু আম কুড়োতে লাগল।

একটা ডালের উপর পা ঝুলিয়ে বসে মণ্টু বলল, "আগে সব ক'টা আম কুড়িয়ে নে। নইলে কেউ এসে পড়লে ··"

নীচে থেকে দীনু বলে উঠল—"নে, নে, আম পাড়। কেউ আসছে না এখানে!"

হঠাৎ একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল মণ্টুর মাথায়। ভাবল, দীনুকে সাজা দেওয়ার এই উপযুক্ত সুযোগ। ওপর থেকে ঠিক আঁচ করে পড়তে হবে দীনুর গায়ের ওপর। ব্যস! তাতে ওর 'হালুয়া টাইট' হয়ে যাবে! অথচ কেউ দোষ দিতেও পারবে না। বলা যাবে—'পা হড়কে পড়ে গেছি গাছ থেকে।' হ্যাঁ, খুব ভাল যুক্তি তার মাথায় এসেছে।

যাই হোক না কেন, 'ফার্স্ট বয়' তো বটে! বুদ্ধি হবে না! মনে মনে হাসল মণ্টু—'আজকের ঠেলায় ও জীবনে আর কখনো বিরুদ্ধাচারণ করবে না আমার!'

"নে পাড়!"—নীচে থেকে হেঁকে উঠল দীনু।

"হ্যাঁ, এই যে!"—বলল মণ্টু। তার বুকটা একবার কেঁপে উঠল। নিজের গায়ে লাগবে না তো?

যা হয় হোক, দীনুকে আজ সে শিক্ষা দেবেই।

একবার লক্ষ্য ঠিক রেখে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে হাত-পা আলগা করে দিল মণ্টু! আর ঠিক সেই মুহূর্তে—

একটা আম দেখতে পেয়ে, সেটা কুড়োবার জন্যে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে সরে এল দীনু। একটা ডালের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মণ্টু ছিটকে পড়ল রাস্তায়!

চিৎকার করে উঠল দীনু।

"কি হয়েছে—কি হয়েছে?"—বলতে বলতে বাড়ির সবাই ছুটে এল। দীনু জানাল—গাছ থেকে পড়ে গেছে মণ্টু।

মণ্টুর বাবা মণ্টুর দেহ পরীক্ষা করে বললেন, "তেমন মারাত্মক কিছু ঘটেনি। তবে পিঠে এই যে কাঁটা দুটো ফুটেছে, সহজে বার হবে না এগুলো—হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পিঠ চেরাই করে বার করতে হবে।"

মণ্টুর পিঠে ফুটে ছিল সেই 'মানিক-জোড়', স্বপনের যুক্তিতে ও রাস্তায় পুঁতেছিল যে কাঁটা দুটো!

নতুন গাড়ি—

নতুন ধরনের মোটর গাড়ি। এতে পিস্টন নেই, জল ঢালতে হয় না, আর কলকবজা আজকালকার গাড়িতে যত লাগে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ লাগে। এই গাড়ি টারবাইন শক্তিতে চলে। এই গাড়ি এখন পরীক্ষামূলক অবস্থায়।

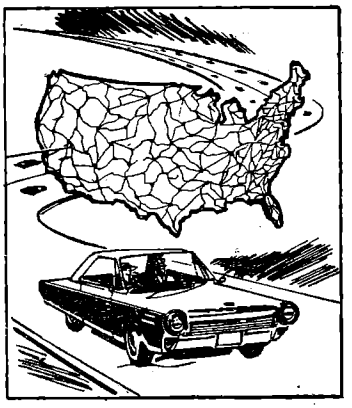

অপরাজিতা মেয়ে

শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পিতা মাদ্রাজ 'নিজাম কলেজের' অধ্যক্ষ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তো দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। তাঁর মেয়েটি যে অঙ্কে একদম কাঁচা! তাই তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ।

বাড়ির সকলকেই একথা বলছেন আর ঘর বার করছেন। বাড়ির সকলেও তাঁর সঙ্গে একমত যে এ মেয়ে নির্ঘাৎ ফেল করবে। আর মেয়েটি কি করছে জানো? খালি কবিতার পর কবিতা লিখছে। এদিকে ঘাড়ের উপর যে প্রবেশিকা পরীক্ষা নামক হুতোম পেঁচাটা এসে পড়েছে, সেদিকে মেয়ের খেয়াল নেই। বারো তেরো বছর বয়স হল মেয়েটির, তবুও পিতার এই দুশ্চিন্তার কারণটি সে জানলো না! মেয়েটির কেবল ভালো লাগে কবিতা লেখা। তাও আবার ইংরেজীতে কবিতা লেখা হচ্ছে। মেয়েটি পুচকে ছোট্ট হলে কি হবে? ইংরেজীতে একদম পাক্কা। বাড়ির সবাই বলেন, এটা ওর পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু কে কার কথা শোনে? বাঙালীর মেয়ে হয়ে ইংরেজীতে কবিতা রচনা করা কি চাট্টিখানি কথা? কিন্তু মেয়ে তাইই করছে।

দেখতে দেখতে পরীক্ষার দিন এসে গেল। প্রবেশিকা পরীক্ষা। তোমরা ভাবছো নিশ্চয়ই মেয়েটি ফেল করলো? কেমন? না, মেয়েটি যথা সময়েই পরীক্ষার ফল ভাল করলো। অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে বাবার সকল দুশ্চিন্তা দূর করলো। বুঝলে?

আর যে ইংরেজী কবিতা রচনা করছিল মেয়েটি, তার খবর শুনবে? তখন ষোল বছরও বয়স হয়নি মেয়েটির। ইংরেজীতে একখানা চমৎকার নাটকই লিখে ফেললো মেয়েটি। এইখানেই শেষ নয়। শোন, সেই ইংরেজী নাটক খানা পড়ে হায়দ্রাবাদের নিজাম মহারাজ পর্যন্ত চমকে উঠলেন।

শুধু তাই নয়। মেয়েটিকে বিলেতে পাঠাবার সমস্ত খরচ বহন করলেন তিনি। তা হলেই বোঝ ঠ্যালা? নিজাম মহারাজ মেয়েটির ইংরেজীতে লেখা নাটকখানি পড়ে কত খুশী হলেন?

বিলেতে যেয়েও মেয়েটি কবিতা লেখা ছাড়লো না। পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে চললো ইংরেজীতে কবিতা রচনা। অচিরেই এই মেয়েটি তাই সেখানে 'ইণ্ডিয়ান নাইটিংগেল' অর্থাৎ 'ভারতের বুলবুল' আখ্যা পেলো।

তারপর দেশে ফিরে এসে মেয়েটি দেখলো ভারতবাসীদের উপর ইংরেজ শাসকদের কত অত্যাচার চলছে! এবার কেঁদে উঠলো মেয়েটির প্রাণ। নাঃ আর কবিতা লেখা নয়। ঝাঁপিয়ে পড়লেন অসহযোগ আন্দোলনে। ভারতমাতার মুক্তির জন্যে। তাই ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার নির্যাতন মেয়েটির উপরেই চললো। অনেক কষ্ট দিল মেয়েটিকে ওরা। কিন্তু অপরাজিতা মেয়েটি এখানেও দমলো না। কষ্টকে কষ্ট বলে গ্রাহ্য করলো না।

ভারত মাতার মুক্তি যে তার চাইই। তাই ইংরেজ শাসকদের দেওয়া শত দুঃখু কষ্ট সে হাসি মুখে সহ্য করে চললো।

আজ আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীন। এই অপরাজিতা মেয়েটিকে জানো? ইনিই হচ্ছেন দেশবরেণ্যা 'ভারতের বুলবুল' কবি সরোজিনী নাইডু। বুঝলে?

হাজারীবাগ থেকে শ্রীমতী হেনা রায় তাঁর আদরের ভাইপো বাচ্চুর (পরিমল) মৃত্যুতে তার পুণ্যস্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"৺পরিমল স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

জন্ম : ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬
মৃত্যু : ১লা আশ্বিন, ১৩৭৮

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু :
একটি আশ্চর্যজনক মৃত্যু

রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ : ৩১শে ভাদ্র, ১৩৮০। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আগামী অগ্রহায়ণ সংখ্যা শুকতারায় প্রকাশিত হবে।

প্রথম পুরস্কার পনের টাকা ● দ্বিতীয় পুরস্কার দশ টাকা

নতুন ধাঁধা

১। আমি তুমি সকলেই বাস করি শিরে,
শেষ যদি দেখ ত ভয়ে যাবে মরে।

—উত্তমকুমার বটব্যাল, মালিয়াড়া।

২। এক চাষী ১০ কেজি ওজনের একটি কড়াই, ১৫ কেজি ওজনের একটি বাছুর এবং ১০ কেজি ওজনের দুইটি কোদাল লইয়া গ্রামে ফিরিতেছে। তাহাকে গ্রামে যাইতে একটি নদী পার হইতে হইবে। নদীটিতে একটি মাত্র নৌকা ছিল। সেই নৌকায় মাঝি সমেত ১১০ কেজি ওজনের এতটুকু বেশী জিনিস বহন করা যায় না। মাঝির ওজন ৪০ কেজি এবং চাষীর ওজনও ৪০ কেজি। এখন চাষী কিভাবে তার সমস্ত জিনিসগুলি নিয়ে একবারেই নদী পার হবে?

—সোমনাথ ঘটক, রঘুনাথপুর।

৩। এক টাকার খুচরো আনবার জন্য মহাজনকে চার আনা বাটা দিতে হয়। এক ব্যক্তি তার চাকরকে কুড়িটি টাকা দিয়ে বললেন, "বাটা দিয়ে এই কুড়ি টাকার খুচরো নিয়ে আয়।" চাকর মহাজনের কাছ থেকে টাকা ভাঙিয়ে এনে বাবুকে তাঁর প্রাপ্য পনের টাকা দিয়েও নিজে একটা টাকা লাভ করল। কি ভাবে লাভ করল বল দেখি?

—পার্থব্রত চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা-৬।

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

১। পাষণ্ড ২। কলিকাতা

৩। অমল প্রথমে দুটো মগই জলে ভর্তি করে বালতির সব জল ফেলে দিল। তারপর ৩ সেরি মগের জল বালতিতে রেখে ৫ সেরি মগ থেকে জল নিয়ে ৩ সেরি মগ ভর্তি করে এবং ঐ তিন সের জল আবার বালতিতে ঢেলে রাখে। বালতিতে ৬ সের ও ৫ সেরি মগে ২ সের জল রইল।

এবার অমল পাঁচ সেরি মগের জল ৩ সেরি মগে রেখে বালতির জল নিয়ে ৫ সেরি মগটা ভর্তি করল। বালতিতে রইল ১ সের জল। এরপর ৫ সেরি মগ থেকে জল

নিয়ে ৩ সেরি মগটা ভর্তি করল। ৩ সেরি মগে আগে থেকেই ২ সের জল ছিল, আর এক সেরে পূর্ণ হয়ে গেল। ঐ ৩ সের জল সে ফেলে দিল। ৫ সেরি মগে ছিল চার সের জল। সেই জল দ্বারা তিন সেরি মগটা ভর্তি করতে ৫ সেরি মগে রইল ১ সের জল। এবার তিন সেরি মগের সব জল ফেলে দিয়ে বালতিতে যে এক সের জল ছিল, সেটা ঢেলে নিল।

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—নির্বাণকুমার ও রুণা গাঙ্গুলী—ভূপেন বোস এভিনিউ ; মামা, বাণ্টু ও শ্যামল—বি. টি. রোড ; রিণ্টু, বাবুল, রত্না, বুলু ও লাটিম—এয়ার পোর্ট গেট ; প্রবীর, সন্দীপ, অমল, পরেশ ও সন্তোষ রায়—জামির লেন ; পার্থপ্রতিম ভট্টাচার্য—বিবেকানন্দ নগর ; সত্য, শান্তি, পরেশ প্রভৃতি—এজরা স্ট্রীট ; পরেশ, তরুণ, মিনু, বাবু, রিংকু, শান্তি ও দাদু—সূর্য সেন স্ট্রীট ; বুটু, পুলপুলি, রীতা প্রভৃতি—যাদবপুর ; বাবু ও টুটু—সরশুনা ; রীণা চট্টোপাধ্যায়—তালতলা এভেনিউ ; ডল, স্মৃতি, কবিতা ও বিশ্বনন্দন দাশ—গর্চা ফার্স্ট লেন ; কৌশিকী মজুমদার—টালিগঞ্জ।

২৪ পরগনা- দীপঙ্কর, অনিরুদ্ধ, বুদ্ধদেব ও তাপস—ব্যারাকপুর ; অশোক রায় ও মৃণাল সোম—অশোকনগর ; অসিতবরণ পাল ও শান্তিময় হাজারী—আমতলা ; রতন, তপন, বাসু, জয়া, শুভ, বাবু, সত্য ও বাবা—বারাকপুর ; শান্তিময়, মনতোষ ও সন্তোষ হাজারী—দেউলী।

হাওড়া—বিমানকাকু, খুকু, লিসা, ভাই, পাম্বুল, লালি ও বুড়কু—ইছাপুর রোড।

হুগলী—অভীক, শৌভিক ও কৌশিক শ্রীমানী, মা ও বাবা—রিষড়া ; যূথিকা, অলোকা ও শৈলবালা—বাঁশবেড়িয়া ; বাণী, ইন্দ্রাণী, দেবাশিস ও চন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া।

বর্ধমান—সন্দীপন, উদয়ন, সুলেখা ও সিদ্ধার্থ সান্যাল, আসানসোল ; মৃণাল, মৌসুমী, মধু ও মায়া সাহা—দুর্গাপুর-৯ ; শ্যামল, শেখর, রুবি, ববি ও খোকা—আসানসোল ; মধুমিতা ও রাণা দাশগুপ্ত—খাদকা পলিটেকনিক ; সৌমিত্র, ছায়া, গৌতম, অসিত ও অন্যান্য—কুলটী ; মা, বাবা, ন'কা, নীলাঞ্জন ও তথাগত মুখোপাধ্যায়—বর্ধমান ; ভারতী, মিনতি, প্রণতি, জয়লক্ষ্মী, নির্মাল্য প্রভৃতি—বরাকর ; সুদর্শন দে—নতুনগঞ্জ।

নদীয়া—দেবাশীষ, মৌসুমী ও রঞ্জু—কৃষ্ণনগর ; সুস্মিতা ও সুদীপ্ত মাইতি—কল্যাণী।

মেদিনীপুর—তোতন, সজল, গৌতম, বাবুন, দিদিভাই প্রভৃতি—গড়বেতা।

বাঁকুড়া—তপনদা, জেঠু, অশোকদা, বাপী, বুবুন ও টুবুল—বিষ্ণুপুর ; আশামুকুল ও বেলা রায়—বিষ্ণুপুর।

পুরুলিয়া—বাপ্পা, রাণী, মিঠু ও বুবুন—সান্তালদি ; ভুজঙ্গ, দীনবন্ধু, দিনেশ, সুদর্শনা ও সুদর্শন মাজী—কুমারডি ; সঞ্জীব, শ্যামাপদ, নিধিরাম ও যুধিষ্ঠির—মেট্যালশহর ; অঙ্গদ, লক্ষ্মণ, সুদর্শন, সন্তোষ প্রভৃতি—দুয়ারী মহুলবনা।

কুচবিহার—কালী, টিঙ্কু, অক্ষয় ও পাণ্ডুমামা—কুচবিহার।

জলপাইগুড়ি—হিমাদ্রি, নীলাদ্রি, স্বপন, পাঞ্চালী, জয়দীপ প্রভৃতি—কাঁটালগুড়ি।

দার্জিলিং—রতন বর্মন রায়—অরবিন্দপল্লী।

বিহার—উজ্জ্বল ও কুশল চৌধুরী—বোকারো ; অমিত, রণজিৎ ও রীতা—কুমারডুবি ; তনিমা, অমিত, শ্রাবণী ও সুজিত—ভোজুডি ; বিপ্লব মুখার্জী—জামসেদপুর-৪ ; দীপা, বুলবুল ও বাবলু—ঝরিয়া ; স্বপন, কবিতা, তরুণ, বাবা ও মামা—হিনু।

উড়িষ্যা—অরুণিমা ও পিয়ালী বেরা—ভুবনেশ্বর।

আসাম—রাজা, মৌ, মিষ্টি ও মুক্তা পুরকায়স্থ—কেহাং চা বাগান ; আল্পনা, বন্দনা, কল্পনা, পার্থ, সোমা ও রুমা—গৌহাটী।

মধ্যপ্রদেশ—মা, সুবীর, জ্যোতি, দীপ্তি, উৎপল, জয়ন্ত ও প্রশান্ত—রায়পুর ; ওঙ্কার, শমিতা, মধুমিতা, পুতুল, মা ও বাবা—বিলাসপুর ; চন্দন, স্বপন, নন্দন, বনমালী, দীপা, ছবি ও সোনা ব্যানার্জী—রায়পুর।

উত্তরপ্রদেশ—শান্তাদেবী, সুব্রত ও ভাস্কর—গণেশ মহল্লা।

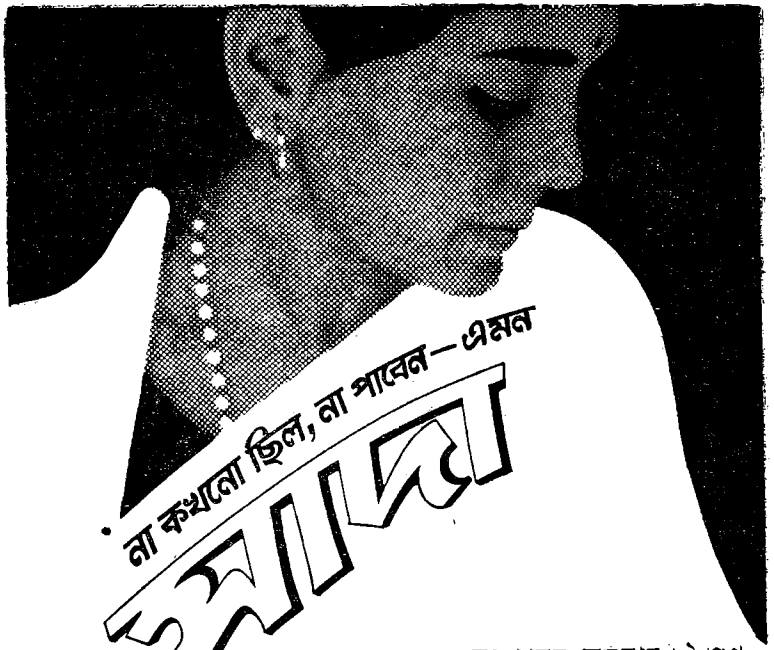

সাবানের তুলনায় ১½ গুণ বেশী কাপড় ধোয়

সাবানের তুলনায় অর্ধেক মেহনত—দু'গুণ পরিষ্কার—
তা সে জল যে ধরণেরই হোক

ডেট কেক

Shilpi HPMA-38a/72 Ben

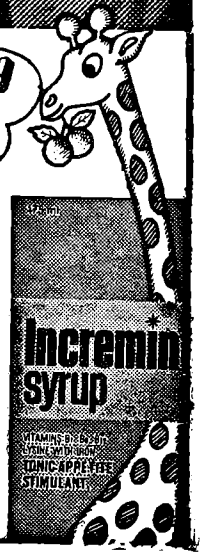

বলুন তো এদের মধ্যে কার মা
ইনক্রিমিন* খেতে দেন?
ঠিক ধরেছেন!
ড্রপ্‌স—২ মাস থেকে ২ বছরের শিশুদের জন্যে
সিরাপ—১৪ বছর অবধি বয়েসের বাচ্চাদের জন্যে
বড়ো হওয়ার বড়ো সহায়!
এই তো বাড়ন্ত বয়েসের ছেলেমেয়েদের জন্যে সেরা টনিক!
ইনক্রিমিন* টনিক
বাড়তি আহারকে বাড়তি বৃদ্ধিতে পরিণত করে।
ডাক্তারদের কাছে নির্ভরযোগ্য নাম Lederle
সায়নামিড ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি বিভাগ
* আমেরিকান সায়নামিড কোম্পানীর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক
Incremin
syrup

সাবধান ! সাবধান !! সাবধান !!!

=জালিয়াত বাহির হইয়াছে=

আমরা এইমাত্র জানিতে পারিলাম যে **নন্টু দত্ত নামে** একজন অপরিচিত ব্যক্তি দেব সাহিত্য কুটীরের প্রতিনিধি সাজিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিদের নিকট **শুকতারা, নব কল্লোল** ও অন্যান্য পুস্তকে নানারকম সুবিধার প্রলোভন দেখাইয়া **অগ্রিম লইতেছে।** এই ব্যক্তি বা অন্য কেহ আমাদের নাম করিয়া টাকা চাহিলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ পুলিসে ধরাইয়া দিবেন। পুলিসে জানান হইয়াছে।

দেব সাহিত্য কুটীর

বাজারের সেরা অভিধান—

সুবলচন্দ্র মিত্র প্রণীত

নূতন মুদ্রণ

সরল বাঙ্গালা অভিধান মূল্য টা. ২৮·০০

ডাকমাসুল সহ টা. ৩৩·০০ স্থলে টা. ২৮·০০ অগ্রিম পাঠালে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

Century Dictionary (ENG.-BENG.) Price Rs. 13·00

Century Dictionary (BENG.-ENG.) Price Rs. 13·00

ডাকমাসুল সহ টা. ১৬·০০ স্থলে মাত্র টা. ১৩·০০ অগ্রিম পাঠালে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

Pocket Dictionary (ENG.-BENG.) } শীঘ্রই নূতন সংস্করণ

Pocket Dictionary (BENG.-ENG.) } প্রকাশিত হচ্ছে

NEW BENGAL PRESS (Private) Ltd., 68, College Street, Calcutta-12

এবার পূজায়
দেব সাহিত্য কুটীরের
ছোটদের জন্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপহার

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ

বিশ্বের নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য এটি এক অসাধারণ বই। এই বই পড়ে বহু অজানাকে জানা যাবে, এর পাতায় পাতায় বিচিত্র ছবি কত না দেখা জিনিসকে চোখের সামনে তুলে ধরবে। ছবিতে ভরপুর প্রায় ৯০০০ পৃষ্ঠার বইটি না দেখলে না পড়লে বোঝাই যাবেনা কি বিচিত্র এই বই। কত সুন্দর, কত জ্ঞানের ভান্ডার এই বই।

২৫·০০ টাকা পাঠালে রেজেষ্টারী করে পাঠান হয়

দেব সাহিত্য কুটীর
২১, ঝামাপুকুর লেন • কলিকাতা - ৯

Regd. No. C. 3063 "Suktara"

তপোবন

এবার পূজায়

দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত

পূজাবার্ষিকীর নাম **তপোবন**

তপোবন-এ ছেলেমেয়েদের মন-ভোলান লেখা এবার লিখবেন এদেশের সমস্ত বিখ্যাত সাহিত্যিকরা। তাছাড়া থাকবে ছবিতে গল্প, কার্টুন এবং অসংখ্য একরঙা ও তিনরঙা ছবি।

মূল্য ৮·০০ টাকা

অনামিকা

মধুসূদন মজুমদার সম্পাদিত **অনামিকা**

নাম অনামিকা হলেও বহু নামী লেখকের লেখায় ভরা এই বই ছেলেদের মন ভোলাবে। মূল্য ৫·০০ টাকা

শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়ের

গল্প বলি শোন

শোনবার মত গল্প করে বলতে জানেন এই লেখক। কখনও পথ চলতে চলতে, কখনও রূপকথা রাজ্যের মনমাতানো কাহিনী লেখকের লেখনী থেকে বেরিয়ে আসে। এই সব গল্পে ভরা এই বই পূজার এক নতুন উপহার। মূল্য ৫·০০ টাকা

দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত

রোমাঞ্চকর চিত্রকাহিনী

শুধু ছবি আর ছবি। সিনেমার কাহিনীর মত করে আঁকা অসংখ্য ছবির মধ্যে দিয়ে নানা দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর গল্প বলা হয়েছে। মূল্য ৫·০০ টাকা

ছোটদের বুক অব নলেজ

বহুদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশ করেছে ছেলেদের জন্য **বুক অব নলেজ**। যা সত্য তাই বিস্ময়কর। **বুক অব নলেজ** দেখলেই তা বোঝা যায়। মূল্য ২৫·০০ টাকা

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ, কলিকাতা-৯